Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবিয়া ইসলাম রেবিনা

রোলঃ 227020927

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবিয়া ইসলাম রেবিনা

রোলঃ 227020927

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবিয়া ইসলাম রেবিনা, আইডিঃ 227020927 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

রাবিয়া ইসলাম রেবিনা

আইডিঃ 227020927

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান, আল-আকসা মসজিদ, যা নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মেরাজের স্থান। এছাড়া, ফিলিস্তিন মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু, এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রাম মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সংহতির প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কারণে:

➤ ধর্মীয় গুরুত্ব

আল-আকসা মসজিদ: ফিলিস্তিনের জেরুজালেম শহরে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। ইসলাম ধর্মে মক্কা এবং মদিনার পর আল-আকসা মসজিদকে অত্যন্ত সম্মানিত স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মেরাজের ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে তিনি আল্লাহর কাছে রওয়ানা হন এবং সেখান থেকে সিদরতুল মনতাহা পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

➤ ইতিহাসের গুরুত্ব

- **ইসলামের বিস্তার:** ফিলিস্তিন ইসলামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন মুসলিম শাসকবংশের শাসন ছিল। উমাইয়া, আব্বাসি, এবং অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনকালেও ফিলিস্তিন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

- **বাইতুল মুকাদ্দাস:** ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসও ইসলামের পবিত্র স্থান হিসেবে উল্লেখযোগ্য, যেহেতু এটি ইহুদিদের পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা এবং ঐতিহ্যের অংশ।

➤ পবিত্র ভূমি এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক

ফিলিস্তিনের ভূমি মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, কারণ এখানে ইসলামের প্রসার এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির অবদান রয়েছে।

ফিলিস্তিনে মুসলমানদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিজয়, যেমন উমাইয়া, আব্বাসি ও অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনকালে এই অঞ্চলে মুসলমানদের উপস্থিতি প্রমাণিত।

➤ ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থানসমূহ

আল-আকসা মসজিদ ও অন্যান্য পবিত্র স্থান মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত। এর উপর ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরও ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে, যা অনেক সময় সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য একটি ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত।

➤ রাজনৈতিক গুরুত্ব

- **ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম:** ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য মুসলিম বিশ্বের সমর্থন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক লক্ষ্য। মুসলমানরা মনে করেন, ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব, এবং ফিলিস্তিনের অগ্রগতি মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি সংহতির প্রতীক।

- **ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষ:** ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইসরায়েলি আগ্রাসন এবং ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ এবং ন্যায্যতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি তাদের ধর্মীয় এবং মানবাধিকারিক দায়িত্বের অংশ।

➤ মুসলিম বিশ্বে ঐক্য এবং সংহতি

ফিলিস্তিন মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য এবং সংহতির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা এমন একটি বিষয় যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে এবং তাদের বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।

➤ আন্তর্জাতিক প্রভাব

ফিলিস্তিনের সমস্যা কেবল মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে নয়, বরং সারা বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। এটি মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করতে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলমানদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মূলত এই সব কারণেই মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন এক গভীর ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে, যা মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিনের বিশেষ মর্যাদাকে তুলে ধরে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিলিস্তিনের ভৌগলিক পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি

➤ ফিলিস্তিন পরিচিতি

কোরআনের ভাষায় ফিলিস্তিন অঞ্চলের নাম **"বিলাদ আশ-শাম"**। বর্তমানের সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও পূর্ণ ফিলিস্তিন ভূখণ্ড "প্রাচীন মুলকে শাম(Levant)" এর অন্তর্ভুক্ত।

ফিলিস্তিন মধ্যপ্রাচ্যের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। আরবিতে—فلسطين। সরকারিভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র যা আরবীতে— دولة فلسطين (দাউলাত ফিলাসতীন) নামে পরিচিত। ফিলিস্তিন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের নির্বাসন ঘোষিত একটি রাষ্ট্র, এটি আলাদা কোনো দেশ নয়। ১৫ নভেম্বর ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্স শহরে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন (পিএলও) ও প্যালেস্টাইন জাতীয় পরিষদ (পিএনসি) একপাক্ষিক ভাবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ দ্বারা প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন বিভাগ যেভাবে প্রস্তাবিত হয়েছিল, সেখানে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড (গাজা ভূখন্ড ও পশ্চিম তীর) ছাড়াও ইসরায়েল শাসনাধীন কিছু অঞ্চল এবং জেরুজালেমকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে দাবী করে তারা। ২২ নভেম্বর ১৯৭৪, থেকে ফিলিস্তিন একটি জাতি হিসেবে জাতিসংঘের ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪৬ টি দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিলিস্তিনের ভৌগলিক পরিচিতি

ফিলিস্তিন পশ্চিম এশিয়ার দক্ষিণ লেভান্ট অঞ্চলের একটি দেশ যা ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর মাঝে অবস্থিত (যেখানে বর্তমান ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড অবস্থিত)। এটি বৃহত্তর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব জেরুজালেম এবং গাজা স্ট্রিপ সহ ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরকে ঘিরে রেখেছে, যা সম্মিলিতভাবে অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে ফিলিস্তিন। জেরুসালেম বা আল-কুদস ফিলিস্তিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এটি পূর্বদিক থেকে **"জায়ন"** ও পশ্চিমদিক থেকে **"জয়তুন"** পাহাড় দিয়ে ঘেরা।



ছবিতে: ফিলিস্তিনের মানচিত্রে West Bank & Gaza Strip

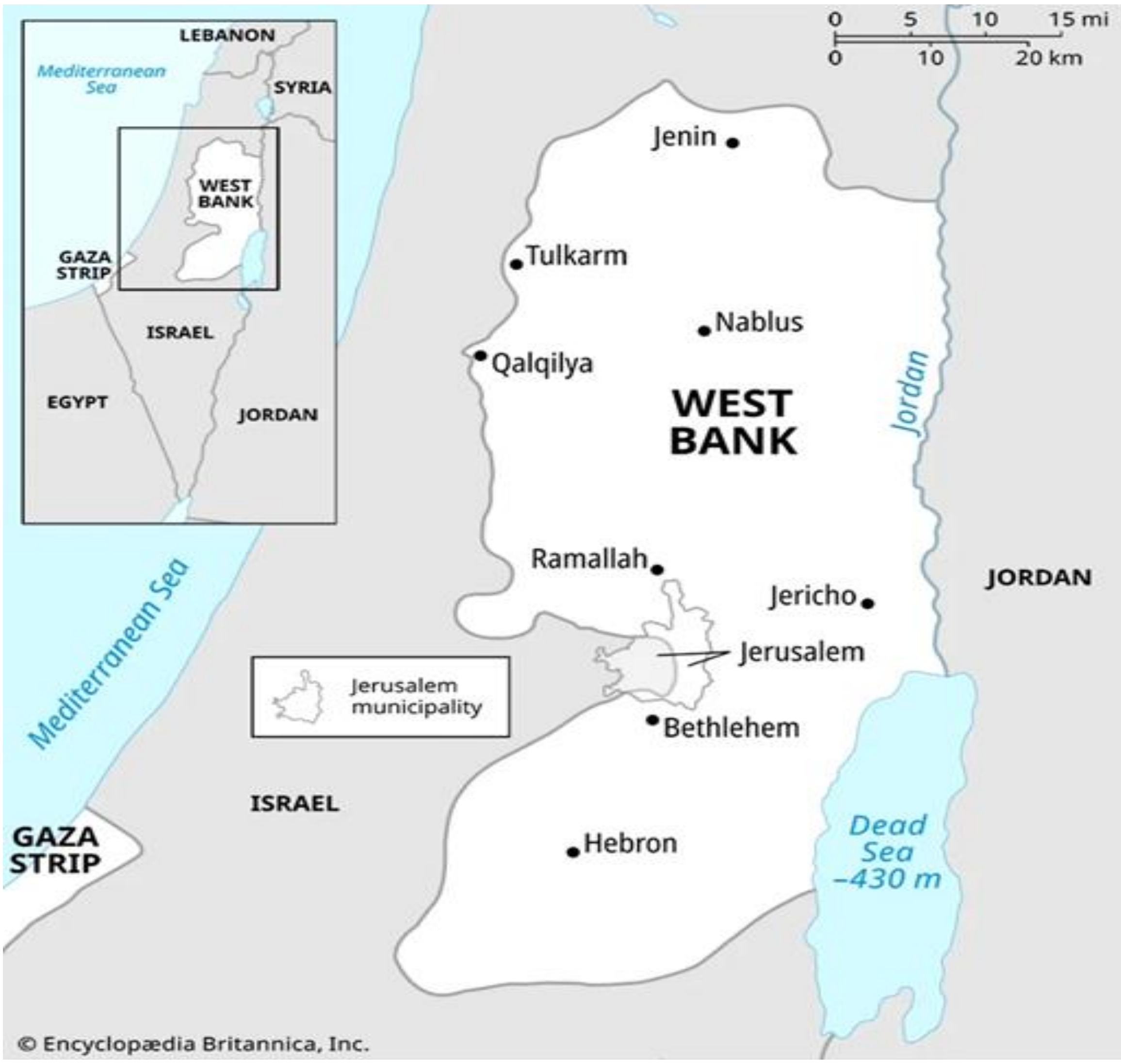
ফিলিস্তিন মূলত দুটি ভৌগোলিক অংশে বিভক্ত:

1. পশ্চিম তীর/ West Bank
2. গাজা/Gaza Strip

➤ **পশ্চিম তীর/ West Bank / পূর্ব জেরুজালেমঃ**

পশ্চিম তীর বলতে জর্ডান নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলকে বোঝায়। এটি উপকূলের কাছে একটি স্থলবেষ্টিত অঞ্চল , এরপূর্বে জর্ডান এবং মৃত সাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশরের সীমানা এবং উত্তর ও পূর্বে ইসরাইল।পশ্চিম তীর ছিল আরব রাষ্ট্রের একটি অংশ যার সৃষ্টি **২৯ নভেম্বর ১৯৪৭** সালে।পশ্চিম তীরের মোট এলাকা হল ২২৭০ বর্গ মাইল (৫৮৮০ বর্গ কিমি)। ইসরায়েল পশ্চিম তীরের প্রায় অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে, যখন ফিলিস্তিন সরকার বাকী অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে। পশ্চিম তীর ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ।

পূর্ব জেরুজালেম ছাড়াও এর প্রধান **শহরগুলি** হল বেথলেহেম, হেব্রন, জেরিকো, নাবলুস, রামাল্লা, তুলকারম এবং জেনিন। এছাড়া পশ্চিম তীরে মোট **১৯টি শরণার্থী** শিবির রয়েছে।



ছবিতে: পশ্চিম তীর/West Bank

➤ **গাজা/Gaza Strip/গাজা উপত্যকাঃ**

গাজা ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত একটি স্ব-শাসিত ফিলিস্তিনি অঞ্চল।গাজা উপত্যকা এবং সমস্ত ফিলিস্তিনের বৃহত্তম শহর হলেন গাজা শহর। গাজা স্ট্রিপের সিনাই উপদ্বীপের ঠিক পশ্চিমে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ–পশ্চিমে রয়েছে মিশর এবং উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে ইসরায়েল।গাজা স্ট্রিপের প্রায় 140 বর্গ মাইল (363 বর্গ কিমি) এলাকায় চারটি শহর, আটটি ফিলিস্তিনী শরনার্থী শিবির ও এগারোটি গ্রাম।গাজা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি।এছাড়া শরনার্থী শিবিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দক্ষিণ গাজার রাফা শরণার্থী শিবির।



ছবিতে: গাজা/ গাজা উপত্যকা/ Gaza Strip

➤ **আয়তন ও জনসংখ্যা**

এই অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ২৭,০০০ বর্গকিলোমিটার, যেখানে এর জনসংখ্যা পাঁচ মিলিয়ন লোকের বেশি। এর ঘোষিত রাজধানী জেরুজালেম , যখন রামাল্লা প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। 2023 সালে উচ্ছেদের আগে গাজা শহরটি ছিল তার বৃহত্তম শহর ।

ফিলিস্তিনের বেশ কিছু পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে; গাজা স্ট্রিপের সম্মুখীন সমস্যাগুলির মধ্যে মরুকরণ অন্তর্ভুক্ত; মিঠা পানির লবণাক্তকরণ; নিকাশীচিকিৎসা; পানিবাহিত রোগ; মাটির অবক্ষয়; এবং ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের অবক্ষয় ও দূষণ। পশ্চিম তীরে, একই সমস্যাগুলির অনেকগুলি প্রযোজ্য; যদিও মিঠা পানি অনেক বেশি, চলমান বিরোধের কারণে প্রবেশাধিকার সীমিত।

এই অঞ্চলে তিনটি পার্থিব ইকোরিজিয়ন পাওয়া যায়: পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় শঙ্কু-স্ক্লেরোফিলাস-বিস্তৃত পাতার বন, আরব মরুভূমি এবং মেসোপটেমিয়ার ঝোপ মরুভূমি।

➤ **জলবায়ু**

ফিলিস্তিনে তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। পশ্চিম তীরের জলবায়ু বেশিরভাগই ভূমধ্যসাগরীয়, উপকূলরেখার তুলনায় উঁচু এলাকায় সামান্য শীতল, পশ্চিমে অঞ্চল। পূর্বে, পশ্চিম তীরে শুষ্ক এবং গরম জলবায়ু দ্বারা চিহ্নিত মৃত সাগরের পশ্চিম উপকূলরেখা সহ জুডিয়ান মরুভূমির বেশিরভাগ অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গাজার একটি গরম আধা-শুষ্ক জলবায়ু রয়েছে (কোপেন: BSh) মৃদু শীত এবং শুষ্ক গরম গ্রীষ্মের সাথে। °ফা)। শীতলতম মাস হল জানুয়ারিতে তাপমাত্রা সাধারণত 7 °C (45 °F)। বৃষ্টি কম হয় এবং সাধারণত নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে পড়ে, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার প্রায় 4.57 ইঞ্চি (116 মিমি)।

ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

 পতাকা	 জাতীয় মর্যাদাবাহী নকশা
জাতীয় সঙ্গীত:	"فدائي" "ফিদা'ই" "Fedayeen Warrior"
অবস্থা	আংশিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্র, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র জাতিসংঘের ১৪৪টি সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত
রাজধানী	পূর্ব জেরুজালেম (সীমিত স্বীকৃতি) রামাল্লা
সবচেয়ে বড় শহর	গাজা সিটি (2023 সালের আগে), বর্তমানে প্রবাহে
সরকারি ভাষা	আরবি
ধর্ম	ইসলাম
জাতীয়তাসূচক বিশেষণ	ফিলিস্তিনি
সরকার	এককেন্দ্রিক আধা-রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতন্ত্র
রাষ্ট্রপতি	মাহমুদ আব্বাস
ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী	মোহাম্মদ মোস্তফা

আইন-সভা	জাতীয় পরিষদ
গঠন	
স্বাধীনতার ঘোষণা	১৫ নভেম্বর,১৯৮৮
ইসরায়েলের সাথে সার্বভৌমত্বের বিরোধ	চলমান
আয়তন	
মোট	৬০২০ কিমি২ ২৩২০ বর্গমাইল (১৬৩তম)
পানি (%)	৩.৫
পশ্চিম তীর	৫৬৫৫ কিমি২
গাজা ভূখণ্ড	৩৬৩ কিমি২
জনসংখ্যা	
২০২৩ আনুমানিক	৫,৪৮৩,৪৫০ জন (১২১তম)
ঘনত্ব	৭৩১/কিমি২ (১৮৯৩.৩/বর্গমাইল)
মুদ্রা	মিশরীয় পাউন্ড (EGP) ইসরাইলি শেকেল (ILS) জর্ডানীয় দিনার (JOD) ফিলিস্তিনি পাউন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিলিস্তিনের ভূমিতে নবীদের পদচিহ্ন

আল্লাহ ফিলিস্তিন ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে অসংখ্য নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন। ইবরাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), মুসা (আ.), দাউদ (আ.), সুলাইমান (আ.), ঈসা (আ.) ও আরো অনেক নবী-রাসুলের অনুসারীরা এই ভূমিতে বসবাস করতেন। ফিলিস্তিন অসংখ্য নবী-রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এর আশপাশে অনেক নবী-রাসুলের সমাধি আছে। কিয়ামতের আগে ঈসা (আ.) এ অঞ্চলে আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল সেখানেই নিহত হবে।

➤ ফিলিস্তিনে ইবরাহীম (আঃ) এর আগমন

মধ্যব্রোঞ্জ যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৫৫০) ৪৫০ বছরের এই ধাপটি ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগেই এখানে ইবরাহীম আ.-এর মাধ্যমে প্রথম তাওহীদের প্রকাশ ঘটে। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম খলিলুল্লাহ। ইরাকের বাবেল শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহর একত্ববাদের পয়গাম পৌঁছাতে গিয়ে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হন তিনি। এক আল্লাহর ইবাদতের অপরাধে তার বাবা তাকে দেশান্তরিত করার হুমকি দেয়। ঈমান রক্ষায় স্ত্রী সারা, ভাতিজা লুতসহ প্রথমে হাররান, সেখান থেকে হালবে তারপর ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরত করেন ইবরাহিম আ.। যখন তিনি ইরাক থেকে হিজরত করে (খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০) ফিলিস্তিনে আসেন তখন ছিল হেকসোসদের শাসনামল। তারা মূর্তিপূজারি হলেও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। তারা ইবরাহীম আ.-কে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দেয়। ফিলিস্তিনেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জেরুজালেমেই তাকে সমাহিত করা হয়।

➤ ফিলিস্তিন ইসমাঈল (আ.) এর জন্মস্থান

বাইতুল মুকাদ্দাসে হিজরতের পর দীর্ঘ ২০ বছর নিঃসন্তান থাকেন ইবরাহিম আ.। বিবি সারা ইবরাহিম আ. কে বললেন, আল্লাহ আমাকে সন্তান দেননি। আপনি আমার দাসী হাজেরাকে বিয়ে করেন। হতে পারে আল্লাহ তার থেকে সন্তান দান করবেন। হাজেরার গর্ভে ফিলিস্তিনে ইসমাঈল আ. জন্মগ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাঈলসহ হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসেন। এ হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ফিলিস্তিনের শেকড়ের সম্পর্ক। হযরত ইসমাঈল আ. মক্কায় সারাজীবন কাটিয়ে দেন। মৃত্যুর পর তাকে এখানেই সমাহিত হন।

➤ ইসহাক আ.-এর জন্মভূমি ফিলিস্তিন

হযরত ইবরাহিম আ.-এর দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক আ.। স্ত্রী সারার গর্ভ থেকে ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ এমন সময় পেয়েছেন, যখন উভয়ে শেষ বয়সে উপনীত হন। ইসহাক আ. ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে সেখানেই বসবাস করেন। তিনি ফিলিস্তিনেই ইন্তেকাল করেন। সেখানেই কবরস্থ হন।

➤ ফিলিস্তিনে আল্লাহর নবী লুত আ.-এর বসবাস

হযরত লুত আ.-এর বসবাস ছিলো বৃহত্তর ফিলিস্তিনে। তিনি ইবরাহিম আ.-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তার সঙ্গে ফিলিস্তিনে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে ইবরাহিম আ.-এর পরামর্শে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকা সাদুম ও আমুরায় চলে যান। ঐহিতাসিকদের বর্ণনা মতে যা বর্তমান মৃত সাগর ও তার তীরবর্তী এলাকা। সেখানকার লোকেরা নিকৃষ্ট ও ঘূর্ণিত স্বাভাবের ছিলো। তারা সমকামিতায় আসক্ত ছিলো। লুত আ. তাদের এহেন ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বললেন।

এ ঘৃণিত অপরাধের কারণে সাদুম ও আমুরাবাসীর ওপর আসমানি গজব নেমে আসে। আল্লাহর হুকুমে লুত আ. পাশ্ববর্তী পাহাড়ে চলে যান। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন।

➤ ইয়াকুব (আ.) এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন

ইসমাঈল আ.-এর জন্মের ১৩ বছর পর ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াকুব আ.। তিনি ইসহাক আ. ছেলে। ইবরাহিম আ. এর নাতি। তার জন্ম ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে তিনি বেশ তাৎপর্যের অধিকারী।ভাই ইসুর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে, মা রাফকার পরামর্শে তিনি দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে চলে যান। সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থানের পর স্ত্রী-সন্তানসহ ফিলিস্তিনে চলে আসেন। ইয়াকুব আ.-এর বারোজন ছেলে ছিল। শেষ বয়সে মিশরে হিজরত করেছিলেন তিনি। সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। মিশরেই তাকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি সন্তানদের ওয়াসিয়ত করেছিলেন, মিশর ত্যাগকালে তার লাশ যেন ফিলিস্তিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওয়াসিয়ত অনুযায়ী তার লাশ ফিলিস্তিনে নিয়ে আসা হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি বাইতুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয় ।

➤ বনী ইসরাইল

ইয়াকুব আ.-এর আরেক নাম ইসরাইল (অর্থ আল্লাহর বান্দা)। সেই হিসেবে তার বংশধরদেরকে বনী ইসরাইল বলা হয়। ইউসুফ আ. একসময় ইয়াকুব আ.-কে সপরিবারে মিশরে নিয়ে যান। ইউসুফ আ. ও তাঁর ভাইয়েরা প্রায় ১৫০ বছর মিশরে বসবাস করেন। সেটা ছিল হেকসোসদের আমল। আগেই বলা হয়েছে, তারা ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

একসময় ফারাও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট আহমোসের কাছে হেকসোসরা পরাজিত হয়। ফারাওরা বনী ইসরাইলকে মনে করত হেকসোসদের সহযোগী। তাই বনী ইসরাইলের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড জুলুম-নির্যাতন। এ নির্মমতা চলে ৩ শ বছর পর্যন্ত। এই সময়ে বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে ব্যাপক ধস নামে। অথচ মহান আল্লাহ ইহুদি জাতিকে তাদের সময়ে

শ্রেষ্ঠ জাতি করেছিলেন, তবে তাদের অপরাধপ্রবণতা, ঔদ্ধত্য আচরণ ও অহমিকার কারণে তারা বিরাগভাজন হয় এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিপীড়িত জাতিতে পরিণত হয়। ভয়, লাঞ্ছনা, মিথ্যা, মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ,বিশৃঙ্খলা, অসংখ্য নবী-রাসুলকে হত্যা, আল্লাহকে দোষারোপ, মানুষকে তাচ্ছিল্য করা তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। একপর্যায়ে তারা তাওহীদ ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়।

বনি ইসরাইলের অপকর্মের কারণে মহান আল্লাহ তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত করেন। বারবার আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হয়েছে। তারা জালিম শাসকের নিয়ন্ত্রণে থেকে লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّا سِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗذٰلِكَ بِاَ نَّهُمْ كَا نُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰ يٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَ نْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَا نُوْا يَعْتَدُوْنَ

'আল্লাহ ও মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া তারা যেখানেই ছিল লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়েছে, কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১২)

➤ ইউসুফ আ.-এর শৈশব কাটে ফিলিস্তিনে

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আ.। যার ঘটনাকে কোরআন আহসানুল কাসাস বলেছে। তিনি হযরত ইয়াকুব আ.-এর ছেলে। দক্ষিণ ইরাকের ফাদ্দান আরামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এরপরই পিতা ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে ফিলিস্তিনে চলে আসেন। শৈশবের কিছুদিন ফিলিস্তিনেই কাটে তার। ছোটবেলায় তিনি ভাইদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। পরে নবুয়াত লাভ করার পর মিশরের মন্ত্রী হন।

নিজের পিতা ও ভাইদের মিশর নিয়ে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তবে মৃত্যুকালীন ওয়াসিয়ত অনুযায়ী তার লাশকেও ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

➤ মূসা (আঃ) এর আগমন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০ সালের দিকে তাদের মাঝে মূসা আ. প্রেরিত হন। তার আগে জন্ম হয় হারুন আ.-এর। নানান জুলম-নির্যাতন অতিক্রম করে, ফেরাউনের লোহিত সাগরে সলিল সমাধির মধ্য দিয়ে বনী ইসরাইল মিশর ত্যাগ করে সিনাই উপত্যকায় আসে। সেখানে তারা নানান বিশৃঙ্খলা করে নবী মূসা ও হারুন আ.-কে যারপরনাই কষ্ট দেয়। একপর্যায়ে তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। শহর রক্ষা প্রাচীরের কাছে যাত্রাবিরতি দেয়। বিরতির পর মূসা আ. তাদেরকে শহরে প্রবেশ করতে বললে তারা এই বলে অস্বীকৃতি জানায়, এখানে এক পরাক্রমশালী জাতির বাস। এই পরাক্রমশালী যোদ্ধা জাতি ছিল কেনআনীরা।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ তারা তীহ প্রান্তরে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। এসময়ে মূসা আ.-এর ইন্তেকাল হয়।

➤ ইউশা ইবনে নুন (আঃ) এর আগমন

মূসা আ.-এর ইন্তেকালের ১০ বছর পর আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১৯০ সালে ইউশা আ. বনী ইসরাইলকে নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনে বসবাস করতে থাকেন। তার জীবদ্দশায়ই বনী ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা করে। ইউশা আ.-এর ইন্তেকালের পর ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়। এসময়ের মধ্যে তাদের অবাধ্যতা চরমে পৌঁছে। পৌত্তলিকতা তাদের ওপর চেপে বসে। তাদের প্রিয় তাবুত, যার মধ্যে মূসা আ.-এর লাঠি ছাড়াও অন্য আরও পবিত্র বস্তু ছিল, তারা হারিয়ে ফেলে। নানান ঘটনার পর তালুতের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সে যুদ্ধে দাউদ আ.-ও অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর। তিনি দুষ্ট শাসক জালুতকে হত্যা করেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি জালুতের ওপর বিজয় লাভ করেন।

➤ আল্লাহর নবী ও ফিলিস্তিনের বাদশাহ দাউদ (আ:)

খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ ঈসাব্দে দাউদ আ. আলকুদস শহরে প্রবেশ করেন। নবুয়াত লাভের আগে তিনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে তালুতের দলে যুদ্ধে শরিক হন। অত্যাচারী বাদশাহ জালুতকে তিনি হত্যা করেন। আসদুদ, বাইতে দুজান, আবু গাওস, বাইতুল মুকাদ্দাস ও রামলার শাসক ছিলেন তিনি। তিনি সবচেয়ে বড় ইহুদী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তা ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৭৪% অঞ্চল। এটাই ছিল ফিলিস্তিনে ঈমান ও আহলে ঈমানের প্রথম আধিপত্য। ফিলিস্তিনে ইবরাহীম আ. কেবল দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। ইউশা আ. ফিলিস্তিনের খুব বেশি এলাকা দখলে আনতে পারেননি। দাউদ আ. চল্লিশ বছর শাসন করেন। ফিলিস্তিনেই তিনি ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রামলাগামী পথের ডানপার্শ্বে একটি পাহাড়ে তাকে সমাহিত করা হয়।

➤ হযরত সুলাইমান আ.-এর মাতৃভূমি ফিলিস্তিন

হযরত সুলাইমান আ. হযরত দাউদ আ.-এর ছেলে। দাউদ আ. এর ইন্তেকালের পর সুলাইমান আ. উত্তরাধিকারী হন। আল্লাহর নবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোটা পৃথিবী শাসনকারী শাসকদের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা পশু-পাখি, বায়ুমণ্ডল ও জিন জাতিকে তার অধীন করে দিয়েছিলেন। এই মহান নবীর জন্ম, বসবাস সবই ছিলো ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক। তাঁর প্রভাবের সামনে বনী ইসরাইল মাথা নুইয়ে রাখলেও তাঁর ইন্তেকালের পরপরই ইহুদীরা পুরোনো চরিত্রে ফিরে যায়। সুলাইমান আ.-ও ৪০ বছর শাসন করেন। তিনি ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ পুনঃনির্মান করেন। ইহুদীরা যে ওখানে সুলাইমানী ট্যাম্পল থাকার কথা দাবি করে, নানান অনুসন্ধান করেও তার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। খ্রিষ্টপূর্ব ৯২৩ সালে ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে তাকে দাফন করা হয়।

➤ ইয়াহইয়া আ.-এর জন্মস্থান ফিলিস্তিন

আল্লাহর আরেক নবী হযরত ইয়াহইয়া আ.-এর জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে। হযরত জাকারিয়া আ.-এর দোয়ায় আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধ বয়সে দান করেন ছেলে ইয়াহইয়া আ.-কে। তার মর্যাদা, তাকওয়া, জনপ্রিয়তা ও আল্লাহর দিকে আহ্বান-এর কারণে তিনি ইহুদিদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। যার কারণে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভেতরে তাকে শহিদ করা হয়।

আল্লাহ ফিলিস্তিনে অনেক নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন। ফিলিস্তিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড ছিল এবং এখানেই অনেক নবীর জন্ম, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

তৃতীয় অধ্যায়: প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-আকসার গুরুত্ব

মুসলমানদের কাছে মসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিন অসামান্য মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য ও প্রাণাধিক প্রিয়। কোরআন হাদীসে ফিলিস্তিন ও মসজিদুল আকসার গুরুত্ব অনেক।

বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদ আল-আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। বায়তুল মুকাদ্দাস অর্থ পবিত্র ঘর। আরবি আকসা শব্দ দূরত্বকে বলা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস বা বায়তুল মাকদিস ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইনের কুদস অথবা জেরুজালেম বা (পুরাতন নাম) ইলিয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস চল্লিশ দিনের সফর। এদিক দিয়ে মসজিদে হারামের তুলনায় বায়তুল মাকদিসকে কোরআনে 'মসজিসদুল আকসা' (দূরতম মসজিদ) বলা হয়েছে।

মসজিদ আল-আকসা কোনো সাধারণ মসজিদ নয়। হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তার জীবনের একটি বড় অংশ সাহাবিদের (সঙ্গীদের) মসজিদ আল-আকসার অমূল্য গুণাবলীর প্রতি সচেতন করতে ব্যয় করেছেন। মসজিদ আল-আকসাকে একজন মুমিনের পরিশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্রহণ করার কিছু কারণ হলো:

- এটি মুসলিমদের প্রথম কিবলা;
- এটি আল-ইসরা ও আল-মি'রাজের স্থান;
- এটি পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বিতীয় ঘর;
- এটি এমন একটি স্থান যেখানে আল্লাহর (ﷻ) শত শত রাসূলের কবর রয়েছে;
- এটি এমন একটি স্থান যেখানে অনেক সাহাবির কবর রয়েছে;
- এটি এমন একটি স্থান যেখানে আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক মুজেজা প্রদর্শিত হয়েছে;
- এটি এমন একটি স্থান যা আল্লাহ (ﷻ) নিজেই 'বরকতময় স্থান' বলে আখ্যায়িত করেছেন;
- এটি কুরআনে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৭০ বার উল্লেখিত হয়েছে;
- এটি এমন একটি স্থান যেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর বার্তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন;
- এটি পৃথিবীর একমাত্র স্থান যেখানে সকল রাসূল একসাথে মসজিদে নামাজ পড়েছেন এবং তাদের ইমামতী করেছেন হজরত মুহাম্মদ (ﷺ);
- এটি কাবা ব্যতীত কুরআনে উল্লেখিত একমাত্র মসজিদ এবং হাদীসের আলোকে তৃতীয় সম্মানীত শহর।

সেজন্য ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে সবসময়ই মর্যাদার, গুরুত্বের ও ভালোবাসার। এ ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তৃতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোরআনের আয়াত ও হাদীসের বর্ণনার আলোকে ফিলিস্তিন

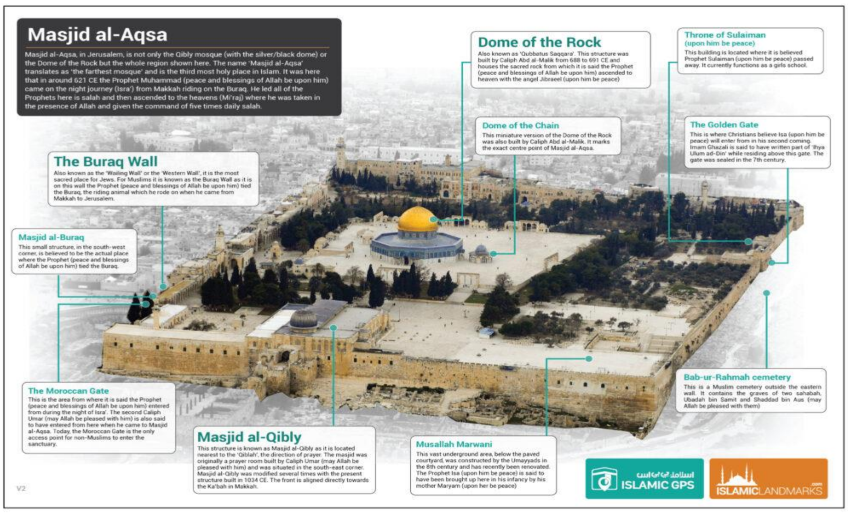
বায়তুল মুকাদ্দাস

হযরত ইব্রাহিম (আ.) জেরুসালেমে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করছিলেন। কাবা নির্মাণের চল্লিশ বছর পর (খ্রিষ্টপূর্ব ২১৭০) তিনি এটিকে আরও সম্প্রসারণ করেন। যা পরবর্তীকালে ‘বাইতুল মুকাদ্দাস’ নামে পরিচিত হয়। এরপর (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০৪) হযরত সুলাইমান (আ.) জিনদের মাধ্যমে এটিকে আরো সম্প্রসারণ করেন।

➤ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَا حُهَا شَهْرٌ ۚ وَ اَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِا ذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَا بِ السَّعِيْرِ

"আর সুলাইমানের জন্য (আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম) বাতাসকে। তার সকালের অতিক্রমণ ছিল এক মাসের পথ আর সন্ধ্যার অতিক্রমণ ছিল এক মাসের পথ। আমি তার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জ্বিন তার সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার অনুমতিক্রমে। তাদের যে কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করে, তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।" (সুরা: সাবা, আয়াত: ১২)



আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গনের পুরো সীমানা ও ভেতরের মসজিদ ও স্থাপনাগুলোর পরিচয়। ছবিঃ সংগৃহীত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গমনস্থলঃ ইসরা ও মিরাজ

ইসলামের ইতিহাস ও বিশ্বনবির জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো ইসরা ও মিরাজ। ইসরা ও মিরাজ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সন্তান মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম বড় মুজিযা। আর মুজিযা ওই ঘটনাকেই বলা হয়, যা সাধারণ সক্ষমতার বাইরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সংঘটিত হয়।

ইসরা ➤ ইসরা অর্থ রাতে ভ্রমণ করা। মক্কাতুল মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাসুল (সা.)-এর বিশেষ ভ্রমণ ইসরা হিসেবে পরিচিত।

মিরাজ ➤ মিরাজ অর্থ, আরোহণের মাধ্যম বা ঊর্ধ্ব ভ্রমণ। ভূপৃষ্ঠ থেকে নভমণ্ডলে ভ্রমণ করা। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সাত আসমানের ওপর সিদরাতুল মুনতাহায় গমন ও সেখান থেকে আবার বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসা সৃষ্টিজগতের সেরা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও তাৎপর্যপূর্ণ এ ঘটনাটিই মিরাজ হিসেবে পরিচিত।

একদিকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াতে নিজেকে বিলীন করে দিচ্ছেন। অন্যদিকে কাফেরদের নির্মম অত্যাচার ও অবর্ণনীয় বাক্যবাণে তিনি বিধ্বস্ত। মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম জুলুম-অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট। তবুও হৃদয়ে তারা ঈমানের আলো জ্বেলে রেখেছেন। এভাবেই এগিয়ে চলছে ইসলামের প্রচার-প্রসার। আশ্রয় ও সান্তনার বিরাট দুটি বৃক্ষ একে একে চলে গেছেন। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। খাজা আবু তালিব ও উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা রা.। আশা ছিল, তায়েফবাসী যদি কথাগুলো একটু মেনে নেয়! তাওহীদের দাওয়াত কবুল করে! না, তারাও সাড়া দিল না। শুধু কি তাই, নির্দয়ভাবে ক্ষতবিক্ষত করল প্রাণপ্রিয় নবীজীকে। এমন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ডেকে নিলেন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বজগতে। রাতের এক খণ্ডে, জিবরাঈলকে পাঠিয়ে, বুরাকে চড়িয়ে। আর মসজিদে আকসার দেশ ফিলিস্তিনের বুকেই রচিত হয় সায়্যিদুল আম্বিয়ার সে শ্রেষ্ঠতম নৈশভ্রমনের ইতিবৃত্ত। সেসময় সৃষ্টির সেরা মানবের পদস্পর্শে ধন্য হয় পৃথিবীর বরকতময় ও স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিন। সে রাতে নবীজি মসজিতে আকসা থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত নৈশভ্রমণ করেন। এরপর বায়তুল মাকদিস হতেই তিনি উর্ধ্বাকাশে গমন করেন।

➤ কুরআনের ভাষায়-

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। -(সূরা ইসরা,আয়াত :১)

➤ আল্লাহ তা'আলা সূরা নাজমে আরো বলেন-

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى، لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

বস্তুত সে তাকে (হযরত জিবরাঈল আ.-কে) আরও একবার দেখেছে। সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তবতীর্ কুলগাছ)-এর কাছে। তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস, যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ ধোঁকায় পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি তা লংঘনও করেননি যে, তার সামনে কী আছে তা দেখতে যাবে।) বাস্তবিকপক্ষে, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে। -(সূরা নাজম, আয়াত ১৩-১৮)

ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনায় সংক্ষেপে এতটুকুই বলা হয়েছে। আর বিস্তারিত এসেছে হাদীসের পাঠগুলোতে।

➤ আনাস ইবনু মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন-

"আমার নিকট বোরাক নিয়ে আসা হল, বোরাক হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু সাদা, লম্বা, গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চর থেকে ছোট, তার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে সে তার পা রাখে, তিনি বলেন: আমি তাতে সওয়ার হলাম, অবশেষে আমাকে বায়তুল মাকদিস নিয়ে আসা হল, তিনি বলেন: আমি তাকে সে খুঁটির সাথে বাঁধলাম যার সাথে নবীগণ বাঁধেন। তিনি বলেন: অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করি, তাতে দু'রাকাত সালাত আদায় করি, পরিশেষে সেখান হতে আমাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। (সহীহ বুখারী ৩৬০৮)

মসজিদে আকসার গুরুত্ব বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মেরাজ রজনীতে আমাদের নবীজী ঊর্ধ্বজগতের সফর শুরু করার পূর্বে জিবরীল আমীনের সাথে প্রথমে এই মসজিদে এসেছেন এবং নামায আদায় করেছেন। তিনি ইমামতি করেছেন আর সমস্ত নবীগণ তাঁর ইকতিদা করেছেন।

➤ আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাইতুল মাকদিসের বিবরণ দিতে গিয়ে) বলেন—

وقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّه مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِه شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِه صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَه- فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ...

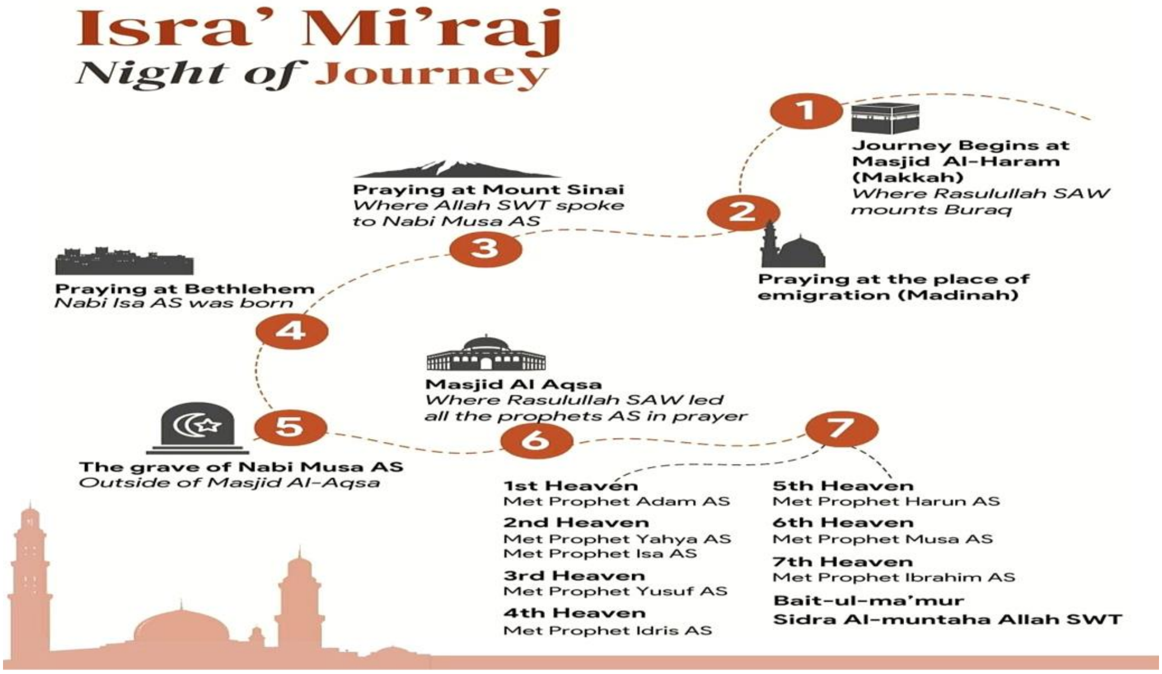
আর আমি নিজেকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের জামাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। দেখি, হযরত মূসা আ. নামাযরত আছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তাঁর চুল কোঁকড়ানো, যা ছিল কান পর্যন্ত ঝুলন্ত। দেখে মনে হবে, যেন 'শানওয়া' গোত্রেরই একজন লোক। হযরত ঈসা আ.-কেও নামাযে দণ্ডায়মান দেখা গেল। তাঁর আকার আকৃতি সাহাবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রা.-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ইবরাহীম আ.-কেও নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হল। নবীজী বলেন, তাঁর দেহাবয়বের সাথে আমার দেহাবয়বের মিল বেশি। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল আর আমি তাঁদের সকলের ইমামতি করলাম। —(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

➤ একটি দীর্ঘ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتى أَمَمْتُهُمْ.

অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করলাম। সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করা হল। জিবরীল আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন আর আমি তাঁদের ইমামতি করলাম। —(সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৪৯)

- সেখানে সকল নবী-রাসূল সমবেত ছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছার পর আজান ও ইকামাত দেওয়া হয়। নবী-রাসুলরা কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যান। জিবরাইল (আ.) রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর হাত ধরে ইমামতির জন্য সামনে বাড়িয়ে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) সব নবী ও রাসুলের ইমামতি করেন। তারপর তাঁর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু হয়।


Isra' Mi'raj
Night of Journey
1
Journey Begins at Masjid Al-Haram (Makkah)
Where Rasulullah SAW mounts Buraq
2
Praying at the place of emigration (Madinah)
3
Praying at Mount Sinai
Where Allah SWT spoke to Nabi Musa AS
4
Praying at Bethlehem
Nabi Isa AS was born
5
The grave of Nabi Musa AS
Outside of Masjid Al-Aqsa
6
Masjid Al Aqsa
Where Rasulullah SAW led all the prophets AS in prayer
7
1st Heaven
Met Prophet Adam AS
2nd Heaven
Met Prophet Yahya AS
Met Prophet Isa AS
3rd Heaven
Met Prophet Yusuf AS
4th Heaven
Met Prophet Idris AS
5th Heaven
Met Prophet Harun AS
6th Heaven
Met Prophet Musa AS
7th Heaven
Met Prophet Ibrahim AS
Bait-ul-ma'mur
Sidra Al-muntaha Allah SWT

ছবিঃ সংগৃহীত

মুসলমানদের প্রথম কিবলা

বায়তুল মাকদিস হলো- মুসলমানদের প্রথম কিবলা। ইসলামের কিবলা ও কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস একটি বহুল আলোচিত ও পর্যালোচিত বিষয়। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবী (সা.) তার সহচরদের নিয়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। যার দিকে মুখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিরা ১০ বছর নামাজ আদায় করেছেন।

➤ মহান আল্লাহ বলেন,
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَا مِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّا سِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِي ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَا خْشَوْنِيْ وَلِاُ تِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

"তুমি যেখান থেকেই বের হও, নিজের মুখ মাসজিদে হারামের দিকে ফিরাও, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, নিজেদের মুখগুলো ওর দিকে করিও, যাতে তাদের মধ্যেকার যালিম লোক ছাড়া অন্যান্য লোকেদের তোমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার না থাকে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করতে পারি, যাতে তোমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পার।" (সূরা বাকারা, ১৫০)

হিজরি দ্বিতীয় সনের শাবান মাসের মাঝামাঝি সময়ে মহানবি (সা.) কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামসহ মদিনার অদূরে মসজিদে বনু সালামায় যোহর মতান্তরে আসরের নামাজ আদায় করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাতের মাঝামাঝি সময়ে মহান আল্লাহ তায়ালা কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ সংবলিত আয়াত নাজিল করেন।

➤ মহান আল্লাহ বলেন,
قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَـنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَا مِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِ نَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَـعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَـقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَا فِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

"নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে ক্বিবলা তুমি পছন্দ কর, আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, ওরই দিকে মুখ ফিরাও; বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের জানা আছে যে, ক্বিবলার পরিবর্তন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রকৃতই সত্য এবং তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফিল নন।" (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৪৪)

- মহানবি (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম চার রাকাতের অবশিষ্ট দুই রাকাত কাবার দিকে ফিরে আদায় করেছিলেন বলে মসজিদটি **"মসজিদে কিবলাতাইন"** বা **" দুই কিবলার মসজিদ"** হিসেবে সমধিক পরিচিত।

➤ এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ.قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কা'বাকে সামনে রেখে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। মদীনায় হিজরতের পরও ষোলো মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরেই নামায আদায় করেছেন। অতঃপর কেবলা কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। —(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৯৯১; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১১০৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৯৬৭)

➤ হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন,

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম মদীনায় এলেন, তাঁর মামাদের বাড়িতে মেহমান হলেন। আর তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে ১৬ থেকে ১৭ মাস পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন। তবে তিনি চাইতেন বাইতুল্লাহ যেন তাঁর কেবলা হয়...। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০, সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৫)



মসজিদে কিবলাতাইন ;ছবি: সংগৃহীত

পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীন মসজিদ

মসজিদ হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। তাওহীদের বাণীর প্রচার-প্রসার ও কুরআন-হাদিস চর্চার আঁতুড়ঘর। সেকালের জ্ঞানচর্চার প্রধান শিক্ষালয়। ইতিহাসে প্রথম নির্মিত মসজিদ মজসিদুল হারাম। তারপরে মসজিদে নববী। এরপরের স্থানে আছে সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুজালেম শহরে অবস্থিত মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ মসজিদুল আকসা। এটা নিংসন্দেহে ফিলিস্তিনবাসী মুসলমানদের জন্যে বিশেষ সম্মানের বিষয়; অন্যান্য মুসলমানদের অশেষ গৌরবের বস্তু।

➤ হযরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ". قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ " ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى ". قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ " أَرْبَعُونَ ".

তিনি বলেন, ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! দুনিয়াতে প্রথম কোন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মসজিদুল হারাম। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তারপর হলো মসজিদুল আকসা। এরপর আমি জানতে চাইলাম যে, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বললেন চল্লিশ বছরের ব্যবধান। (সহিহ বুখারি: ৩৪২৫, মুসলিম: ৫২০)

- এই চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল ভিত্তি স্থাপনে; পুনর্নির্মাণে নয়। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন মাত্র। মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আদম (আলাইহিস সালাম)।

বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় ও প্রহরার বিশেষ গুরুত্ব

কাজের স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কাজের মর্যাদা ও মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তেমনি সালাত আদায় করা ও প্রহরার ক্ষেত্রেও স্থান অনুপাতে এ মর্যাদা শতগুন বেড়ে যায়। বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায়ের বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

➤ এ বিষয়ে এক হাদিসে হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.

মসজিদে হারামের নামায এক লক্ষ নামাযের সমতুল্য। আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায এক হাজার নামাযের সমতুল্য। আর বাইতুল মাকদিসের নামায পাঁচ'শ নামাযের সমতুল্য। —[মুসনাদে বাযযার (কাশফুল আসতার), হাদীস ৪২২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩৮৪৫]

- নূরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন—

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، وفي بعضه كلام وهو حديث حسن.

- এই হাদিসের বর্ণনাকারী নিভরযোগ্য —(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫)

➤ অন্য এক হাদিসে হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত,

আমরা তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আলোচনা করেছিলাম, আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম: কোনটি উত্তম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ নাকি বায়তুল মাকদিসের মসজিদ? তখন রাসুল সা. বললেন, "বায়তুল মাকদিস অপেক্ষা আমার এই মসজিদে নামায চারগুণ উত্তম। আর তা হল শ্রেষ্ঠ নামাযের স্থান।"*হাকেম, মুস্তাদরাক ৪/৫০৯, বায়হাকী শুআবুল ঈমান, ত্বা, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৬/২/৯৫৪)*

- এই হাদিসে বোঝা যাচ্ছে, মসজিদে নববীর দুই রাকাত নামাজ এক হাজার রাকাতের সমান। আর এক হাজারের এক চতুর্থাংশ হলো ২৫০। অর্থাৎ মসজিদুল আকসার দুই রাকাত নামাজ ২৫০ রাকাত নামাজের সমতুল্য।
- অনেকের মতে এটি একটি দুর্বল হাদিস।
-

মসজিদে আকসার খেদমতে অংশগ্রহণ

যদি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করা বা মসজিদে আকসায় নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোনোভাবে এই মসজিদের খেদমতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

➤ মাইমুনা রা. বলেন—

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتًا كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ.

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করতে সক্ষম না হবে, সে কী করবে?

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এখানে আসার সামর্থ্য রাখবে না, সে যেন এখানের বাতি জ্বালানোর জন্য তেল হাদিয়া পাঠায়। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তেল হাদিয়া পাঠাবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে, যে সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করেছে। —(মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৬২৬)

- নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন—رجاله ثقات
- এই হাদিসের বর্ণনাকরী নির্ভরযোগ্য।—(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫)

➤ ১৭ হিজরীতে যখন বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে এল তখন উমর (রা.) এই মসজিদে নামায পড়েছেন এবং নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬১)

- ইবনে কাসীর রাহ. এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলেছেন। —(মুসনাদে ওমর ১/১৬০)

তৃতীয় সম্মানিত শহর ও ফজিলতপূর্ণ ভূমি

মসজিদে আকসার একটি বিশেষ ফযীলত হল, আল্লাহ একে বরকতময় করেছেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আশপাশের জনপদকেও বরকতপূর্ণ করে দিয়েছেন। হাদিসের আলোকে প্রমাণিত যে তিনটি শহর সম্মানিত— মক্কা, মদিনা ও ফিলিস্তিন বা বায়তুল মুকাদ্দাস।

➤ সহিহ বুখারি ও মুসলিমে হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

(ইবাদতের উদ্দেশ্যে) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও মসজিদুল আকসা।' (মুসলিম-৮২৭)

- ফিলিস্তিন প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্যতা এবং নবি-রাসুলের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। আর এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানবির মুখ থেকে উচ্চারিত হয়— তার দিকে সফরের বিশেষ গুরুত্বের কথা। মহানবী (সা.) মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদুল আকসার উদ্দেশ্যে সফরকে বিশেষ পুণ্যময় কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ বার্তা অন্যকোনো মসজিদের ব্যাপারে আসেনি।

গুনাহ মাফের স্থান

মসজিদুল আকসার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি গুনাহ মাফের জায়গা। কেউ যদি নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদুল আকসায় গমন করে, তবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।

➤ আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " . فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ . "

যখন সুলাইমান ইবনু দাউদ (আলাইহিস সালাম) বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্‌র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেনঃ আল্লাহ্‌র হুকুমমত সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিসে কেবলমাত্র সালাত (নামায/নামাজ) পড়ার জন্য আসবে, তার গুনাহ যেন তার থেকে বের হয়ে যায় তার মা তাকে প্রসব করার দিনের মত। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: প্রথম দুটি তাঁকে দান করা হযেছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হবে। (ইবনু মাজাহ ১৪০৮)

নবী-রাসুলের হিজরতভূমি ও আবাসস্থল

যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়াতের জন্যে প্রেরিত মহামানবরা অস্বীকারকারীদের হাতে বর্বরোচিত নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। অস্বীকারকারীরা তাদের অনেককে শুধু নিপীড়ন করে ক্ষান্ত হননি; কাউকে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছেন, কাউকে বা জানে মারার হুমকিও দিয়েছেন। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে তারচেয়ে নিরাপদ ও দাওয়াতের অনুকূল কোনো শহরে কিংবা দেশে তারা হিজরত করেন। পবিত্র কোরআন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও লূত আলাইহিস সালামের নমরুদের অধিকারভূক্ত দেশ হতে অন্যত্রে হিজরত প্রসঙ্গ এসেছে।

➤ ইবরাহীম (আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَا لَ اَرَا غِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِ بْرٰهِيْمُ ۚلَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَ رْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا

হে ইবরাহিম। তুমি তি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও তবে অবশ্যই আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবো। আর তুমি চিরতরে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও। (সুরা মারইয়াম, আয়াত নম্বর ৪৬)

➤ ইসমাইল (আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَا دٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙرَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ فَا جْعَلْ اَ فْـئِدَةً مِّنَ النَّا سِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَا رْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

হে আমার প্রতিপালক। আমি আমার কিছু বংশধরকে আপনার সম্মানিত ঘরের আশপাশে বসবাস করিয়েছি, এমন এক উপত্যকায়, যেখানে কোনো ক্ষেত-খামার নেই। হে আমাদের প্রতিপালক। (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা নামাজ কায়েম করে। মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে ফলমূলের রিজিক দান করুন। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। (সুরা ইবরাহিম, আয়াত নম্বর ৩৭)

➤ ইসহাক আ.(আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْـكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِ سْحٰقَ ۗاِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক দিয়েছেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যাধিক দোয়া শ্রবণকারী। (সুরা ইবরাহিম, আয়াত নম্বর ৩৯)

➤ লুত (আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلُوْطًا اِذْ قَا لَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَأْتُوْنَ الْفَا حِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ• اِنَّكُمْ لَـتَأْتُوْنَ الرِّجَا لَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۗبَلْ اَنْـتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

কোরআনে আল্লাহ বলেন, আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে নিজ জাতিকে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সারাবিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো কামবশত নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করো। বরং তোমরা সীমালঙ্ঘন করছো। (সুরা আরাফ, আয়াত নম্বর ৮০- ৮১)

➤ মুসা (আঃ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَ رْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَـكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَا رِكُمْ فَتَـنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

‘হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ করো এবং পিছপা হয়ো না। হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’ (সুরা মায়িদা,আয়াত : ২১)

- এখানে পবিত্র ভূমি বলতে কোন ভূমি বোঝানো হয়েছে, এ প্রশ্নে তাফসিরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারও মতে বায়তুল মোকাদ্দাস, কারও মতে কুদস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন, আরিহা শহর, যা জর্দান নদী ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর, যা আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, পবিত্র ভূমি বলে দামেস্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হজরত কাতাদাহ বলেন, সমগ্র শামই পবিত্র ভূমি। (ইবনে কাসির)

➤ হযরত দাউদ আ.। তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনের বাদশাহ ও নবী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাসের জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করেছেন, যারা তার আওয়াজের সাথে তাসবিহ পাঠ করতো। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَا لُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَا لطَّيْرَ ۚ وَاَ لَـنَّا لَـهُ الْحَدِيْدَ

নিশ্চয়ই আমি দাউদকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ দান করেছি। হে পাহাড়-পর্বত, হে পাখিরা, তোমরাও দাউদের সঙ্গে আমার তাসবিহ পড়। আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। (সুরা সাবা আয়াত নম্বর ১০)

➤ সুলায়মান আলাইহিস সালামের জন্যে বায়ূকে বশীভূত করে দিয়েছেন। বায়ুতে ভর দিয়ে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে কল্যাণময় দেশে দ্রুততম সময়ে ও অতি সহজে গমনাগমন করতেন।

➤ ফেরাউনের নির্যাতন ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ বনি ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলা তার হাত থেকে উদ্ধার করে বরকতময় ও কল্যাণময় ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি করেছেন। কল্যাণময় ভূমি প্রদানের মাধ্যমে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।

➤মহান আল্লাহ মারয়াম (আ.) ও তার মাতাকে অবস্থানযোগ্য টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُ مَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَا تِ قَرَا رٍ وَّمَعِيْنٍ

‘আমি মারয়াম তনয় ও তার মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।’ (সুরা আল-মুমিনুন, আয়াত : ৫০)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে কল্যাণময় ও বরকতময় স্থান হিসেবে যে অঞ্চল ও দেশকে নির্দেশ করা হয়েছে, ইবনু আব্বাসের মতে তা হলো গয়গম্বরদের পীঠস্থল ফিলিস্তিন ও মসজিদুল আকসা।

বরকতময় ভূখণ্ড ফিলিস্তিন

পৃথিবীর এক বরকতময় স্থান। পবিত্র কোরআনের পাঁচ স্থানে মহান আল্লাহ ফিলিস্তিনকে বরকতময় ও পুণ্যময় ভূখণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

➤ ১. পবিত্র কোরআন তার পাঠককে মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তিনকে নানাভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেও তার বিশেষত্ব বর্ণনায় এ একটি আয়াতই যথেষ্ট। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা মিরাজ ও ইসরার আলোচনা করতে গিয়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ তাআলা বলেন,

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা বনী ইসরাঈল, ০১)

- এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। আর এ কারণে একে বরকতময় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

➤ ২. সাইয়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনার সময় আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَ رْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

"আর আমি তাকে ও (তার ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন দেশে (অর্থাৎ ফিলিস্তিনে) নিয়ে গেলাম যা আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণময় করেছি।"(সুরা : আম্বিয়া, আয়াত : ৭১)

- বেশির ভাগ ব্যাখ্যাদাতার কাছে এ থেকে শাম (বর্তমানে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন) দেশকে বোঝানো হয়েছে, যাকে শস্য-শ্যামলতা, ফলমূল, নদ-নদীর আধিক্য ও বহু নবীর বাসস্থান হওয়ার কারণে বরকতময় ও কল্যাণময় বলা হয়েছে।

➤ ৩. মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনায়, যখন ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আলাইহিস সালাম ও বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করে আনা হয় এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যদলকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَ وْرَثْنَا الْـقَوْمَ الَّذِيْنَ كَا نُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَا رِقَ الْاَ رْضِ وَمَغَا رِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَا نَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَا نُوْا يَعْرِشُوْنَ

"আর আমি দুর্বল করে রাখা লোকেদেরকে সেই যমীনের পূর্বের আর পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম যাতে আমি কল্যাণ নিহিত রেখেছি। এভাবে বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তোমার প্রতিপালকের কল্যাণময় অঙ্গীকার পূর্ণ হল আর ফির'আওন ও তার লোকজনের গৌরবময় কাজ ও সুন্দর প্রাসাদগুলোকে ধ্বংস করে দিলাম।"(সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৩৭)

- এখানে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমির কথা বলা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তাআলা কওমে ফিরআউন ও কওমে আমালেকাকে ধ্বংস করার পর বনি ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

➤ ৪. হযরত সুলাইমান (আ.) কে আল্লাহ পৃথিবীতে বিশেষ রাজত্ব দান করেছিলেন। তার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফিলিস্তিন নামক কল্যাণ রাষ্ট্রের। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَا صِفَةً تَجْرِيْ بِاَ مْرِهٖۤ اِلَى الْاَ رْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ

"(আমার ক্ষমতা বলেই) আমি উদ্দাম বায়ুকে (স্বাভাবিক গতি সম্পন্ন) করেছিলাম সুলায়মানের জন্য। তার নির্দেশ মত তা প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে যাতে আমি কল্যাণ রেখেছি। আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম।" (সুরা: আম্বিয়া, আয়াত : ৮১)

- কল্যাণময় ভূখণ্ড বলতে শামকে (ফিলিস্তিন ও সিরিয়া) বোঝানো হয়েছে।

➤ ৫. সাবা-এর ঘটনায় আল্লাহ তাদের কীভাবে সুখ-শান্তিতে রেখেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۗ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَا لِيَ وَاَ يَّا مًا اٰمِنِيْنَ

"তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করে দিয়েছিলাম এবং ওগুলোর মাঝে সমান সমান দূরত্বে সফর

মনযিল করে দিয়েছিলাম। (আর তাদেরকে বলেছিলাম) তোমরা এ সব জনপদে রাতে আর দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর।"(সুরা : সাবা, আয়াত : ১৮)

- এই জনপদ বলতে মুলকে শাম বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন শামদেশ হলো বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই জনপদ হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। (রুহুল মাআনি, ২২/১২৯)

ফিলিস্তিনের বিশেষ ফল নিয়ে আল্লাহর শপথ

মহান আল্লাহ তাআলা আসমানি প্রত্যাদেশ অবতরণের প্রাণকেন্দ্র বায়তুল মাকদিসের দুটি বিশেষ ফলের শপথ করেছেন।

➤ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَا لتِّيْنِ وَا لزَّيْتُوْنِ

'শপথ ডুমুর ও যায়তুনের'। (সুরা ত্বিন, আয়াত : ০১)

- তাফসিরবিশারদরা বলেন, ডুমুর ও যায়তুন ফলের দেশ হলো বায়তুল মাকদিস। আল্লাহকর্তৃক কোনো অঞ্চলের বিশেষ কিছুর শপথ করার ফলে— সে অঞ্চল ও উক্ত ফলের গুরুত্ব বহু অংশে বেড়ে যায়। এভাবেই পবিত্র কোরআন ফিলিস্তিন ও মসজিদুলর আকসার পরিচয় ও তার স্বতন্ত্রতা বর্ননা করেন।

ফিলিস্তিনের হজ্বযাত্রীদের বিশেষ ফজিলত

ইসলামে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হজ্ব মুমিনদের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল। এ বিশেষ আমলটির রয়েছে সবিশেষ মর্যাদা। এক পবিত্র ভূখণ্ড থেকে আরেক পবিত্র ভূখণ্ডে সফর করা কতইনা আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। তবে বিশেষ অবস্থার কারণে ফিলিস্তিনের হজ্বযাত্রীদের জন্যে নবিজি বিশেষ পুরষ্কার ঘোষণা করেছেন। হজ্বের নির্ধারিত সওয়াব তো থাকছেই, সাথে আছে আরো বিশেষ পুরষ্কার। একারণেই হাদীস শরীফে মসজিদে আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

➤ উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ .

যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ্ করবে, তার গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। —(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০০১)

- ইমাম মুনযীরী রাহ. বলেন— رواه ابن ماجه بإسناد صحيح
- (আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/১৮৮)

বাইতুল মাকদিসের সান্নিধ্যে বসবাস

পবিত্র ভূখণ্ডের সান্নিধ্যে কিছু সময় যাপন করতে পারাই তো সৌভাগ্যের বিষয়। উপরন্তু বসবাসের জন্য যদি এক টুকরো মাটি পাওয়া যায়, তাহলে এটা তো আরো অনেক বড় প্রাপ্তি। একারণেই হাদীস শরীফে বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

➤ আবু যার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا...

অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি যদি ঘোড়ার রশি পরিমাণ জায়গাও পেয়ে যায়, যেখান থেকে বাইতুল মাকদিস দেখা যায়, তাহলে এটা তার জন্য সমগ্র দুনিয়া থেকে বেশি উত্তম হবে। —(মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫০, হাদীস ৮৫৫৩; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৬৯৭৯, ৮২২৬)

- নূরুদ্দীন হাইসামী রাহ. মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৩/৬৭৬) বলেন—رجاله رجال الصحيح
- ইমাম হাকেম রাহ.-ও সহীহ বলেছেন।

বাইতুল মাকদিসে মৃত্যুর তামান্না

পবিত্র ভূখণ্ডে জীবন অতিবাহিত করার পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করাও একজন মুমিনের পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বাইতুল মাকদিস যেহেতু পবিত্রতম স্থান, তাই তো হযরত মূসা আ. এই মাটিতে মৃত্যুর আরজি পেশ করেছিলেন।

➤ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা আ.-এর মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ.

তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁকে পবিত্র ভূখণ্ডের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে পবিত্র ভূখণ্ডে পতিত হবে। যদি আমি সেখানে থাকতাম, তবে লাল টিলার কাছে রাস্তার পাশে আমি তোমাদেরকে তাঁর কবর দেখিয়ে দিতাম। —(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৭২)

- এই হাদীসে পবিত্র ভূখণ্ড দ্বারা বাইতুল মাকদিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লাহর পছন্দনীয় ভূমি

পৃথিবীতে আল্লাহর পছন্দনীয় স্থানসমূহের অন্যতম হলো মক্কা মুকাররামা ও মদিনা মুনাওয়ারা। এছাড়াও তার আরো অনেক প্রিয় স্থান সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

➤ ইবনু হাওয়ালা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেন-

"শিগগিরই অবস্থা এমন হবে যে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল সিরিয়ায়, আরেক দল ইয়ামনে এবং অন্যদল হবে ইরাকে। ইবনু হাওয়ালা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি সে যুগ পাই, তখন আমি কোন দলের সাথে থাকবো তা আপনি মনোনীত করে দিন। তিনি বললেন, তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ করবে। কারণ সিরিয়া হলো- আল্লাহর পছন্দনীয় জমিন। শেষকালে আল্লাহ তাআলা তার নেক ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা সেখানে যেতে না চাও, তাহলে ইয়ামনে চলে যাবে। তোমাদের গবাদিপশকে নিজেদের হাউজ থেকে পানি পান করাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমার উসিলায় সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীর জন্যে জিম্মাদার হয়ে গেছেন। এর ফলে তার বাসিন্দাগণ কুফরের অনিষ্টতা এবং ফিতনা-ফাসাদের হতে নিরাপদ হতে নিরাপদে থাকবে। (সুনানে আবু দাউদ)

কিয়ামতের আগে ঈসা আ. ফিলিস্তিনেই নেমে আসবেন

ঈসা ইবনে মারইয়ামের জন্ম ফিলিস্তিনের বাইতুল লাহামে। যিনি পিতা ব্যতীত আল্লাহর কুদরতের সাক্ষী হিসেবে দুনিয়াতে আগমন করেন। তিনি দোলনায় থাকাবস্থায় নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। মায়ের সতীত্বের সাক্ষ্য দেন।

➤ কোরআনে আল্লাহ বলেন,

ۚقَا لَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا • قَا لَ كَذٰلِكِ ۚقَا لَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ
وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّا سِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚوَكَا نَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

মারইয়াম বলল, আমার ছেলে হবে কীভাবে, অথচ আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। আমি কোনো ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বলল এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, আমার পক্ষে এটা একটি মামুলি কাজ। আমি এটা এজন্য করবো, যেনো একে আমি মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার কাছ থেকে রহমত বানাতে পারি। এটি একটি স্থিরকৃত বিষয়। (সুরা মারইয়াম, আয়াত নম্বর ২০-২১)

তিনি ফিলিস্তিন অঞ্চলে দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করেন। মায়ের সঙ্গে মিশরেও গমন করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে আবার ফিলিস্তিনে চলে আসেন। অভিশপ্ত ইহুদিরা তাকে

জারজ সন্তান ও তার মাকে দুশ্চরিত্রা বলে অপবাদ দেয়। তিনি তাদের বিপক্ষে আল্লাহর কাছে বদ দোয়া করেন। আল্লাহর গজব নেমে আসে ইহুদিদের উপর।

তখন তারা ঈসা আ. কে হত্যার পরিকল্পনা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ কুদরতে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। কিয়ামতের আগে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে নেমে আসবেন। দাজ্জাল কে হত্যা করবেন। ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এরপর তার মৃত্যু হলে নবীজির রওজার পাশে সমাহিত হবেন।

দাজ্জালের মৃত্যুস্থান

কেয়ামতের আগে দাজ্জাল যখন গোটা পৃথিবী জুড়ে তাণ্ডব চালাবে এবং দুর্বল ঈমানদারেরা দলে দলে দাজ্জালের ফেতনায় আপতিত হবে, সেই কঠিন সময়েও মসজিদুল আকসা থাকবে দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্ত।

➤ এ ব্যাপারে রাসুল সা. বলেছেন,

দাজ্জাল চারটি মাসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না: মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন নববী, মাসজিদুত তুর এবং মাসজিদুল আকসা। (মুসনাদে আহমাদ: হা/২৩৬৮৫; শায়খ শুআইব আরনাঊত, সহীহ)

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, আলআকসা বা বাইতুল মাকদিস ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ আর মুসলিম উম্মাহর জন্য কতই না গুরুত্বপূর্ণ।কোরআনুল কারিম ও হাদীসের বর্ণনায় একাধিকবার বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের অসামান্য মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যময় হওয়ার বিষয়টি অলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ফিলিস্তিনের ইসলামিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস

ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার বাহক। এটাই সেই প্রথম ভূখণ্ড, যেখানে প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৯ হাজার বছর আগে মানুষ খেত-খামার ও স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেছিল। পরবর্তী ১ হাজার বছর পরে, খ্রিষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে গড়ে ওঠে **'আরিহা'** নামক নগরী। আরিহা নগরীর পতনের পর থেকে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও অসংখ্য নবী-রাসুল এই পবিত্র ভূমিতে বাসস্থান গড়ে তুলেছেন।

ফিলিস্তিনের ইসলামের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অঞ্চলের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো, যেখানে ইসলাম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশ এবং সংগ্রামের অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। এটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং বহু শতাব্দী ধরে নানা জাতি ও ধর্মের মধ্যে সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- প্রাচীন ইতিহাস
- ইসলামি শাসন
- ব্রিটিশ ম্যান্ডেট
- ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়ঃ অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ইতিহাস

ফিলিস্তিনের প্রাচীন ইতিহাস একটি বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক উন্নয়ন এবং সভ্যতার জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফিলিস্তিন প্রাচীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড বর্তমান ইসরায়েল, পশ্চিম তীর এবং গাজা অঞ্চলে বিস্তৃত, যা ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ব্রোঞ্জ যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা যেমন মিসরীয়, বেবিলনীয়, পারস্য এবং রোমানরা এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

ফিলিস্তিনের প্রাচীন ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় নিম্নরূপ:

১. ক্যানানীয় সম্প্রদায়

প্রাচীন ব্রোঞ্জ যুগের শেষ দিকে, ফিলিস্তিন অঞ্চলে মিশরীয়, হিটাইট, এবং ক্যানানাইট সভ্যতার প্রভাব ছিল। এই সভ্যতাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, যা ফিলিস্তিনের সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

➤ ক্যানানীয় সভ্যতা

প্রাচীন ব্রোঞ্জযুগে ক্যানানীয় এসে ফিলিস্তিনে বসবাস শুরু করে। এ জাতির প্রতিটি শাখা আরব বংশোদ্ভুত। জাযিরাতুল আরব থেকে তারা ফিলিস্তিনে অভিবাসন গ্রহণ করেছিল। তারা ছিল মূর্তিপূজারি। এর সপক্ষে দলীল-দস্তাবেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব নেই। এতে ইহুদীরা যে দাবি করে, তারা ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা- এর অসারতা প্রমাণ হয়। তাদের হাতে বিকৃত তাওরাতও স্বীকার করে, ইহুদীদের আগে **ক্যানানীয়রা ফিলিস্তিনের প্রথম বাসিন্দা** ছিল। নাবলুস, বাইসান, আক্কা, আসকালান, হাইফাসহ দুই শতাধিক শহর তারা গড়ে তুলেছিল। ইহুদীদের ফিলিস্তিন প্রবেশের ১৪০০ বছর পূর্বে তারা আগমন করে। ক্যানানীয় সম্প্রদায় আরব উপদ্বীপ থেকে এ অঞ্চলে আগমন করে। এ কারনে ফিলিস্তিনকে প্রাচীন ইতিহাসে **'আরদে কেনআন'** বলা হয়।

ক্যানান ছিল একটি কৃষি এবং বাণিজ্যিক সমাজ, যেখানে নানা শহর ও রাজ্য গড়ে ওঠে। ক্যানানীয়দের একটি শাখা হল, ফিনিশিয়ান সম্প্রদায়। তাদেরই অবদান **ইতিহাসখ্যাত ফিনিশিয়ান সভ্যতা**। তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী ফিলিস্তিনী এলাকায় বসবাস করত।

আমোরীয়রা ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরেকটি সম্প্রদায়। তাদের থেকেই এসেছে হেকসোস সম্প্রদায়। আলকুদসের গোড়াপত্তন তাদের অন্যতম কীর্তি। তারা এ শহরের নাম দিয়েছিল, **উরসালিম।**

এ যুগের কয়েক শ বছর পর ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে **ব্লেস্ট জনগোষ্ঠী**। তারা এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রিট থেকে। এরাও ইহুদী ছিল না। তারা এ অঞ্চলের নাম রেখেছিল **বালিস্তিন।** সেখান থেকেই পরিবর্তন হয়ে **ফিলিস্তিন** হয়েছে।

➤ ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজা

ক্যানানীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল একাধিক দেবতার পূজায়, যা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল। তারা বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দির ও ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ করেছিল।

➤ ক্যানানীয় যুগে শহরের প্রতিরক্ষা কৌশল

ক্যানানীয়দের সময়ে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ শহর উঁচু দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। এর মধ্যে জেরুসালেম, গাজা, এবং অন্যান্য শহর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা তাদের শাসনকাল এবং প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রমাণ।

➤ ক্যানানীদের অধীনে ফিলিস্তিন

- **মিশরীয় প্রভাব:** মিশরীয়রা ফিলিস্তিনের কিছু অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল, বিশেষত ১৮তম ও ১৯তম ডায়নাস্টির সময়। মিশরীয়রা ফিলিস্তিনে ক্যানানাইটদের ওপর শাসন পরিচালনা করত এবং সেখানে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল।

- **হিটাইটদের প্রভাব:** হিটাইট সাম্রাজ্যও ফিলিস্তিনের কিছু অংশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবে তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

এরপর প্রাচীন ইহুদিরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসে ফিলিস্তিনে বসবাস শুরু করে। এরপর, বিভিন্ন ইহুদি গোষ্ঠী ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করে এবং ইসরায়েল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

২.ইয়াবুসি সম্প্রদায়

আরব উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত থেকে দেশত্যাগ করা গোত্রগুলোর মাঝে **‘ইয়াবুসি’** সম্প্রদায়ও ছিল। আল কুদস নগরী গড়ে ওঠার আগেই এই সম্প্রদায় এখানে বসবাস শুরু করেছিল। এ কারণে ‘আল-কুদস’ নগরীকে তাদের নামের দিকে সম্বন্ধিত করে ‘ইয়াবুস’ ও বলা হতো।

৩. বনী ইসরায়েলের ১২ গোত্র ও ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা

বনী ইসরায়েলি বা হিব্রু জনগণ, যারা মূলত মিশরের গোলামী থেকে মুক্তি লাভের পর ফিলিস্তিনে আসেন, তাদের ইতিহাসের সূচনা হয়। মুসা (আঃ) এর নেতৃত্বে বনী ইসরায়েলের (বর্তমান ইহুদি) জনগণ মিশর থেকে বেরিয়ে এসে ক্যানান ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তাঁদের মধ্যে ছিল ১২টি গোত্র, যেগুলির প্রতিটির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর পর, বনী ইসরায়েল তাদের নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি গোত্র তাদের নিজস্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।

➤ ইসরায়েলী ও ইয়াহুযা সাম্রাজ্য গঠন

সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর পর, বনী ইসরায়েলের ১২টি গোত্র দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়:

- **ইসরায়েলী সাম্রাজ্য:** ১০টি গোত্র ছিল উত্তর ফিলিস্তিনে, যারা ইসরায়েলী সাম্রাজ্য গঠন করে।
- **ইয়াহুযা সাম্রাজ্য:** বাকি ২টি গোত্র, ইয়াহুযা এবং বিনইয়ামিন , দক্ষিণ ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে ইয়াহুযা সাম্রাজ্য গঠন করেছিল।

এই দুটি রাজ্য প্রায়ই বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও পৌত্তলিকতার বিস্তার ঘটেছিল।

➤ ইসরায়েলী সাম্রাজ্যের পতন

বনী ইসরায়েলের ১০ গোত্রের সেই ইসরাইলী সাম্রাজ্য ২০২ বছর টিকে ছিল। একপর্যায়ে তারা অ্যাসিরিয়ানদের হাতে পরাজিত হয়। অ্যাসিরিয়ানরা ছিল ইরাকের অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব ৭২১

এ তারা ইসরাইলী সাম্রাজ্যে হামলা করে। তারা সবকিছু তছনছ করে দেয়। অধিকাংশকে বন্দি করে পৃথিবীর নানান প্রান্তে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এভাবে ইহুদীদের ১০ গোত্র ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

➤ **ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতন**

ইয়াহুযা সাম্রাজ্য আরও ১৫০ বছর টিকে ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে আল্লাহ তাদের ওপর আবার ধ্বংসলীলা চাপিয়ে দেন। ইরাকের সেনাপতি বখতে নসর ফিলিস্তিন আক্রমণ করে ইহুদীদের তছনছ করে দেয়। মসজিদে আকসা ধ্বংস করে দেয়। ৪০ হাজার ইহুদীকে বন্দি করে ইরাকে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে ইয়াহুযা শাসনের অবসান ঘটে। যা ৪১৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল। যার মধ্যে ৮০ বছর ছিল দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর ঈমানী শাসন। বাকি ৩৩৮ বছর ছিল ফেতনা-ফাসাদ ও জুলুম-নিপীড়নের ইয়াহুযা শাসন। বখতে নসরের ধ্বংসযজ্ঞের দীর্ঘ কাল পর তারা ফিলিস্তিনে ফিরে আসে।
ইরাকে যাওয়ার পর তারা তাওরাত সংকলন শুরু করে। এটা মূসা আ.-এর ইন্তেকালের ৭০০ বছর পরের কথা। কারণ তাবুত ও তাওরাতের ফলক চুরি হয়ে গিয়েছিল।

বিশৃঙ্খলা ও পৌত্তলিকতায় উভয় সাম্রাজ্যই বরাবর ছিল। আর এভাবে বনী ইসরায়েলের ১২টি গোত্রের মধ্যে একাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং তাদের ইতিহাস পরবর্তীতে শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৪. ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য

ফিলিস্তিনে ব্যাবিলন শাসনের সূচনা হয় ইয়াহুযা সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে। ব্যাবিলনীয়রারা ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বে জেরুসালেম এবং ইহুদি রাজ্য ধ্বংস করে এবং ইহুদিদের নির্বাসিত করে। এই শাসন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ থেকে ৫৩৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং এটি প্রায় ৪৭ বছর ধরে চলেছিল।

৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বে, ব্যাবিলনীয় রাজা নেবুচাদনেজ্জার দ্বিতীয় জেরুসালেম আক্রমণ করে এবং ইহুদা রাজ্যকে পরাজিত করে। এই সময়ে বহু ইহুদি জনগণকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়, যা বাইবেলের **"ব্যাবিলনীয়রা বন্দিত্ব"** নামে পরিচিত। এই ঘটনা ইহুদি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

এই সময়কালে, পারসিক ও ব্যাবিলনীয়দের মাঝে তীব্র দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ চলছিল। যখন ইহুদীরা সাইরাসের নেতৃত্বে থাকা পারসিকদের সহায়তা দেয়, তখন ব্যাবিলনীয়রা পরাজিত হয় এবং ফিলিস্তিনের শাসন চলে যায় পারসিকদের দখলে।

৫. প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য

ফিলিস্তিন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে, যখন মেসোপটেমিয়ায় বসবাসরত আকেরামানিয়ান রাজা সাইরাস দ্য গ্রেট ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেন। সেই সময় ফিলিস্তিন ছিল ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

➤ ইহুদি সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন

পারস্য শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সাইরাসের ঘোষণার মাধ্যমে বন্দী ইহুদিদের ব্যাবিলন থেকে মুক্তি এবং ফিলিস্তিনে (জেরুজালেমে) তাদের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি। এই সময় জেরুজালেমে ইহুদিরা দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করে। এটি একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের যুগে পরিণত হয়।

➤ পারস্য শাসনের পতন

৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের অভিযানের ফলে পারস্য সাম্রাজ্যের ফিলিস্তিন শাসনের অবসান ঘটে। মেসিডোনীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ফিলিস্তিন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। পারসিকরা ২০৭ বছর ধরে ফিলিস্তিন শাসন করে।

পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনকাল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নমূলক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষত ইহুদিদের ক্ষেত্রে, এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এই সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. হেলেনিস্টিক যুগ

➤ হেলেনিস্টিক যুগের সূচনা

হেলেনিস্টিক যুগ শুরু হয় ৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বে, যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে ফিলিস্তিনসহ লেভান্ট অঞ্চলের অধিকাংশ অংশ দখল করেন। আলেকজান্ডারের বিজয়ের পর, ফিলিস্তিন হেলেনিস্টিক অর্থাৎ গ্রীক, এবং পরে রোমান সংস্কৃতির প্রভাবের বিস্তার হয় এবং গ্রিক সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক কাঠামো এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

➤ গ্রিক সংস্কৃতির প্রভাব

হেলেনিস্টিক যুগে ফিলিস্তিনে গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বিভিন্ন শহর প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে গ্রিক ভাষা ও জীবনধারা প্রচলিত হয়। এই শহরগুলোতে গ্রিক সভ্যতার মৌলিক উপাদানগুলো, যেমন নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান এবং শিল্প, বিস্তৃত হয়ে ওঠে।

➤ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং প্রশাসনিক কাঠামো

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শাসনকালে, তিনি ইহুদিদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পালনে স্বাধীনতা দেন এবং জেরুজালেমে তাদের জন্য বিশেষ মর্যাদা নির্ধারণ করেন। এই সময় ইহুদিরা শাসক হিসেবে আলেকজান্ডারের সমর্থন পেয়ে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

➤ পটলেমীয় শাসন

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর, তার সাম্রাজ্য **পটলেমীয়** (মিশরের শাসক বংশ) এবং **সেলিউসিড** (আরব-এশিয়ার শাসক বংশ) মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অংশ পটলেমীয় সাম্রাজ্যের অধীনে পড়ে। এই সময় মিশরের সঙ্গে ফিলিস্তিনের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং গ্রিক সাংস্কৃতির প্রভাব আরও গভীরভাবে সেখানে বিস্তার লাভ করে।

➤ সেলিউসিড শাসন

পটলেমীয়দের পর সেলিউসিডরা ফিলিস্তিনের শাসন গ্রহণ করে। এই শাসনকালে, গ্রিক সংস্কৃতি আরও প্রচলিত হয়, তবে সেলিউসিড শাসকদের ধর্মীয় নীতি এবং জোরপূর্বক গ্রিক ধর্মের প্রচারের ফলে ইহুদিদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ, ইহুদিরা মাকাবীয় বিদ্রোহ শুরু করে, যা সেলিউসিডদের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ছিল।

➤ মাকাবীয় বিদ্রোহ এবং হাশমোনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

১৬৭ খ্রিষ্টপূর্বে মাকাবীয়রা সেলিউসিডদের বিরুদ্ধে সফলভাবে বিদ্রোহ করে এবং হাশমোনীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল একটি ইহুদি রাজবংশ যা হেলেনিস্টিক বিশ্বের মধ্যে ইহুদিদের আত্মপরিচয়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

➤ হেলেনিস্টিক যুগের শেষে

হেলেনিস্টিক যুগ ফিলিস্তিনে গ্রিক সংস্কৃতির দৃঢ় প্রভাব রেখে যায়, তবে মাকাবীয় বিদ্রোহের পর **ফিলিস্তিনে ইহুদি শাসনের পুনরুদ্ধার** ঘটে। এর পর, রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানে ফিলিস্তিন আরেকটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। এবং এ সময়েই জেরুসালেমে ইহুদি বিদ্রোহ ঘটে। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে, খ্রিস্ট ধর্মের উদ্ভব হয় এবং এটি দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে।

হেলেনিস্টিক যুগ ফিলিস্তিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সময় ছিল, যেখানে গ্রিক সংস্কৃতি এবং ভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে ইহুদিদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছিল। তবে, এই যুগের শেষে **ফিলিস্তিনে স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামও** দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

৭. রোমান যুগ, ঈসা আ. ও খ্রিস্টধর্মের প্রসার

➤ **ফিলিস্তিনে ঈসা (আ.) :** ফিলিস্তিনে রোমানীয়দের শাসনকালেই ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিস্তিনিরা ৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা (আ.)-এর কুফুরীর অভিযোগ আনে। রোমান সম্রাট এ অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে শূলীতে চড়ায়।যা ইহুদি মতাদর্শে তাদের হাতে তার প্রাণ চলে যায়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। **বরং আল্লাহ কুদরতিভাবে তাকে উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে গেছেন।**

ঈসা আ. এর জন্মের পর প্রায় ৩০০ বছর ধরে ফিলিস্তিনে খুব অল্প মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। ৩২৪ ঈসাব্দে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর মা আগেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গোটা রোমান সাম্রাজ্যেই খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পৌত্তলিকরাও দলে দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের চিন্তা-চেতনার প্রভাব খ্রিস্টধর্মেও পড়ে। যার ফলে খ্রিস্টধর্ম এক বিকৃত রূপ নিয়ে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এসময় রোমানরা মসজিদে আকসার কাছেও যায়নি। ফিলিস্তিনে রোমান শাসন ৩১২ বছর স্থায়ী ছিল। একেবারে মুসলমানদের ফিলিস্তিন বিজয়ের আগ পর্যন্ত।

➤ রোমান যুগে ফিলিস্তিনের ইতিহাস

রোমান সেনাপতি আলেকজান্ডার পারস্যকে পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করে এবং ফিলিস্তিন রোমানের প্রদেশ হিসেবে পরিণত হয়। ইহুদীরা তখন আলেকজান্ডারের অধীনে বসবাস করতে থাকে।

রোমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর ছিল। বেশির ভাগ ইহুদী রোমানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যায়, তবে কিছু ইহুদী তাদের ধর্মের প্রতি অটল ছিল।

➤ রোমান শাসনের সূচনা

- রোমান সাম্রাজ্য ফিলিস্তিনের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে, ফিলিস্তিন পটলেমীয় এবং সেলিউসিড শাসনের অধীনে ছিল, কিন্তু রোমানরা ধীরে ধীরে এই অঞ্চল দখল করতে শুরু করে।

- রোমান শাসন ফিলিস্তিনে **প্রভিন্স জুডিয়া** নামে পরিচিত ছিল এবং এটি রোমান প্রদেশের অংশ হয়ে ওঠে। রোমানরা স্থানীয় রাজা হিরোদেসকে শাসক হিসেবে বসান, তবে তাকে রোমানদের শর্তে শাসন করতে বাধ্য করা হয়।

- **হিরোদিয়ান শাসন**

হিরোদস রোমানদের পক্ষে কাজ করতেন এবং তিনি ফিলিস্তিনে বেশ কিছু স্থাপনা, বিশেষ করে জেরুজালেমে ইহুদি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেন।

তার শাসনকালে, ফিলিস্তিনে গ্রিক-রোমান সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তবে হিরোদসের শাসন বিশেষত ইহুদি জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। তিনি শক্তিশালী শাসক ছিলেন, তবে তার শাসনের শেষদিকে ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে।

➤ **ইহুদি বিদ্রোহ এবং রোমান দমন**

- **প্রথম ইহুদি যুদ্ধ:** ফিলিস্তিনের ইহুদিরা রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন, যার ফলস্বরূপ রোমান বাহিনী জেরুজালেম শহরটি দখল করে এবং হেরোডের পুনর্নির্মিত মন্দির ধ্বংস করে দেয়। এটি ইহুদিদের জন্য একটি বিরাট ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আঘাত ছিল।

- **দ্বিতীয় ইহুদি বিদ্রোহ:** হজরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের প্রায় ১০০ বছর পর আবারও শুরু হয় ইহুদিদের বিদ্রোহ। ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বারবুখা-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানের আক্রমণে ইহুদিরা দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। আর হাদ্রিয়ানের সেনাবাহিনী দখলে নেয় আল কুদসের পুরো ইহুদি অঞ্চল। চালায় ধ্বংসের স্ট্রীমরোলার। এ ঘটনার পর থেকে ইহুদিরা আর কখনোই বিদ্রোহের চেষ্টা করেনি। তখন থেকে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আল-কুদস রোমানদের অধীনেই থাকে।
- দ্বিতীয় ইহুদি বিদ্রোহ বা "বার কোকবা বিদ্রোহ" রোমানরা কঠোরভাবে দমন করে, যার ফলে ইহুদিরা ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হয়ে যান।

➤ খ্রিষ্ট ধর্ম এবং রোমান শাসকদের অবস্থান

- রোমান শাসনকালে, জেরুসালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হত। রোমান শাসনকালে, খ্রিস্ট ধর্মের উদ্ভব ঘটে এবং এটি একে একে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

- রোমানরা প্রথমে খ্রিষ্ট ধর্মকে নিপীড়িত করলেও, পরে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন **খ্রিষ্ট ধর্মকে বৈধ ঘোষণা** করেন এবং নিকিয়া সম্মেলন আয়োজন করেন, যা **খ্রিষ্ট ধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্ম** হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে ফিলিস্তিনে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রসার আরও ত্বরান্বিত হয়।

➤ রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং ফিলিস্তিন

- ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য **দুটি ভাগে** বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ফিলিস্তিনের শাসন চালায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনাোপেল। আর পশ্চিম রাোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রাোম।

রাসুল (সাঃ)-এর জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এবং যাবতীয় বিষয়াদি পূর্ব রাোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়,যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোাপল। ফিলিস্তিনসহ সিরীয় ভূখণ্ডগুলো সব এ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। যা হাোক, ৪৭৬ সাল থকে ফিলিস্তিনে শুরু হয় পূর্ব রাোমান সাম্রাজ্যের শাসন। যা রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত প্রায় ১৬০ বছর স্থায়ী হয়।

- ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড রাোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও তা ছিল রাোম ও পারস্যের দ্বন্দের জায়গা। এ রেষারেষির জের ধরে ৬১৪ সালে নববী যুগে সংঘটিত হয় সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। যাতে পারস্য বিজয় লাভ করে। পারসিকরা রাোমানদের থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেয়। এর বিবরণ নিয়ে **আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন,**

الٓـمّٓ ۚ •غُلِبَتِ الرُّوۡمُ ۙ •

আলিফ লাম মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে। (সুরা রোম: ১-২)

- রোমানদের এ পরাজয় মক্কার মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলে। এর সাত বা নয় বছর পর রোমানরা আবার পারসিকদের পরাজিত করে। তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে আধিপত্য ফিরিয়ে আনে। **আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,**

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ •

(রোমানরা পরাজিত হয়েছে) নিকটবর্তী অঞ্চলে। পরাজয়ের পর সত্বর তারা বিজয়ী হবে। (সুরা রোম, আয়াত: ৩)

- **৬৩৬ খ্রিস্টাব্দঃ** ইসলামিক বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ফিলিস্তিনে ইসলামী শাসনের সূচনা হয়।

রোমান যুগে ফিলিস্তিনের ইতিহাস ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ সময় খ্রিষ্ট ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, এবং একই সময় রোমান শাসন ও ইহুদি বিদ্রোহের কারণে ফিলিস্তিনে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে।

৮. রাসূল(সাঃ) এর সময়ে ফিলিস্তিন

৫৭০ ঈসাব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ৬০৯ ঈসাব্দে নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত শুরু করেন। নবীজী (সাঃ) প্রথমে মসজিদে আকসা অভিমুখে নামায আদায় করতেন, যা তার শারীরিক মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসের উদ্দেশে যাত্রার অংশ ছিল।

➤ ইসরা ও মিরাজ

নবুওয়াত লাভের **দ্বাদশ বছরে**, প্রথম বাইআতে আকাবা ও দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার মাঝামাঝি সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসা গমন করেন, যা **ইসরা** নামে পরিচিত। এর পরই তিনি **মিরাজে** গমন করেন, যেখানে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে যান এবং আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

➤ রোম ও পারস্যের যুদ্ধ

রাসূল (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে, তখনকার বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে পারস্য বিজয়ী হয় এবং রোমানরা পরাজিত হয়। বিশ্বাসের দিক দিয়ে রোমানরা মুসলমানদের কাছাকাছি অর্থাৎ আহলে কিতাব হওয়ায়, তাদের পরাজয়ে নবীজী এবং সাহাবায়ে কেরাম মর্মাহত হন। তবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে এবং আবার বিজয় লাভ করে।

➤ ফিলিস্তিন জয়ের সুসংবাদ

আহযাব যুদ্ধের সময়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিন জয়ের সুসংবাদ দেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, যা ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত বিজয়ের আশ্বাস দেয়।

৯. ফিলিস্তিনে মুসলমানদের প্রথম অভিযান

➤ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানের দাওয়াত

অষ্টম হিজরীতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিলিস্তিন, দামেশক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানীর কাছে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠান। শুরাহবিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতকে হত্যা করে। যার পরিণামে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

➤ মুতার যুদ্ধ ও ফিলিস্তিনে মুসলমানদের মনোযোগ

ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডের বিষয়ে নবীজী (সাঃ) সবসময় মনোযোগী ছিলেন। তার ওফাতের এক মাস আগে, তিনি উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রস্তুত করেছিলেন। তবে, নবীজীর ওফাতের কারণে এই বাহিনী অভিযানে বের হতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি শাসন

ইসলামি শাসন (৭ম শতক - ১৯১৭) ফিলিস্তিন অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৭ম শতকে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফিলিস্তিন অঞ্চলটি মুসলিম শাসকদের অধীনে চলে আসে এবং প্রায় ১৩০০ বছর ধরে মুসলিম শাসনের অধীনে ছিল।

➤ দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম শাসন

৭ম শতক থেকে শুরু করে ২০তম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসন একাধিক পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। উমাইয়া, আব্বাসি, ফাতেমীয়, আইয়্যুবিদ এবং মামলুকদের শাসনকাল এই অঞ্চলে ইসলামি সংস্কৃতি ও প্রশাসনের উত্থান ঘটায়।

- ১৫১৭ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিন একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে আসে এবং ১৯১৭ সাল পর্যন্ত অটোম্যান শাসন অব্যাহত থাকে।

- এই দীর্ঘ সময়কালে ফিলিস্তিন রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধি অর্জন করে।

নিচে ইসলামি শাসনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

১. আরবি ও ইসলামিক শাসন

৭ম শতক ফিলিস্তিনের ইতিহাসে আরবি ও ইসলামিক শাসনের সূচনালগ্ন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই ফিলিস্তিন ছিল আরবি মুসলিম শাসনের জন্য একটি প্রধান লক্ষ্য।

- **ইসলামের দ্রুত প্রসার:** ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

- **উত্তরাধিকারী খলিফাদের ভূমিকা:** তাঁর মৃত্যুর পর খলিফারা ইসলামের বিস্তার ও আরবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

- **রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব:** এই সময় ফিলিস্তিনে ইসলামের আগমন কেবল ধর্মীয় নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করে। এটি ছিল একটি স্থিতিশীল ও শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার সূচনা।

২. আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসন

➤ খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রসার

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বিশ্বে **খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত** হয়। প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসনামলে ইসলামের প্রসার শুরু হয়। মুসলিম সেনারা আরব উপদ্বীপের বাইরেও অভিযান শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, পারস্য ও মিশরের মতো অঞ্চলে ইসলাম পৌঁছে যায়।

➤ ইসলামিক আক্রমণ ও ফিলিস্তিনে শাসনের সূচনা

আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। ফিলিস্তিন, যা তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, মুসলিম সেনাদের জন্য একটি কৌশলগত এবং ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল।

- ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অভিযান
- ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বাইজেন্টাইন বাহিনীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

➤ প্রথম সংঘর্ষ: বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসনের শুরু হয় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দিয়ে।

- **রিদ্দাহ যুদ্ধের পর সামরিক প্রস্তুতি:** রিদ্দাহ যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করে।

- **আমর ইবনে আস (রা.) এর নেতৃত্বে আক্রমণ:** মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনে আস (রা.) এবং অন্যান্য নেতৃত্ব ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলে বাইজেন্টাইন বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে আক্রমণ চালান।

- **ইহুদিয়া যুদ্ধ:** ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইউহুদিয়া (বর্তমান জেরুজালেমের আশেপাশের এলাকা) যুদ্ধ মুসলিম বাহিনী এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রধান সংঘর্ষগুলোর একটি। এতে বাইজেন্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করা হয়।

➤ **শাম অভিযানঃ**

- আবু বকর রা.-এর খেলাফতকাল ছিল মাত্র ২ বছর ৬ মাস। এই সময়ের মধ্যেই তিনি শাম অভিযানের জন্য মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন, তবে তিনি অভিযানের পূর্ণতা দেখতে পারেননি, কারণ তার মৃত্যুর আগেই অভিযান সম্পূর্ণ হয় না।

- নবীজীর ওফাতের পর, খেলাফতের বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর, আবু বকর রা. প্রথমে **উসামা ইবনে যায়েদ** রা.-এর বাহিনীকে **সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অভিযানে** প্রেরণ করেন। সিরিয়া বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়।

৩০ রবিউল আউয়াল ১২ হিজরী (১৪ জুন ৬৩৩ ঈসাব্দ) তার নেতৃত্বে শাম অঞ্চলে অভিযান শুরু হয়। শাম অভিযানের ব্যাপারে একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করা হয়, যেখানে সকলেই এই অভিযানে একমত পোষণ করেন।

➤ **আবু বকর রা.-এর খেলাফতকাল**

আবু বকর রা.-এর খেলাফতকাল ছিল মাত্র ২ বছর ৬ মাস। তার শাসনামলে,

- বাইজেন্টাইন শাসিত অঞ্চলে ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।
- ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বাহিনী ফিলিস্তিনের কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ চালায়।
- আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসনকালেই ফিলিস্তিন বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়।
- জেরুজালেমের বিজয়ের জন্য মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইনদের সাথে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর শাসনকালে মুসলিম রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী ভিত্তি পায় এবং ইসলামের বিস্তার আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে পড়ে। তার সময়েই মুসলিম সেনারা ফিলিস্তিনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং বাইজেন্টাইন শাসনের পতন ঘটায়। এটি ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসনের সূচনা হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

৩. উমর ইবনে আল-খাত্তাবের শাসন

➤ খিলাফতের সূচনা

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মৃত্যুর পর, তার উত্তরসূরি উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) খলিফা হন। ৬৩৪ থেকে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, মুসলিম বাহিনী বাইজেন্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করে এবং জেরুজালেম শহর দখল করে। এই যুদ্ধকে **"যুদ্ধে ইয়ামলিক"** বলে। এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল হিসাবে বিবেচনা করা হয়

➤ উমার (রাঃ) এর শাসনকাল

- **৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ:** উমার ইবনুল খত্তাব (রাঃ) এর শাসনকাল শুরু হয়, এবং তার নেতৃত্বে মুসলিমরা পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধ জয় করতে থাকে।

- **৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ইয়র্মূক যুদ্ধ:** এই যুদ্ধটি বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বিজয় ছিল। ইয়র্মূক যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাইজেন্টাইন শাসন শেষ করে এবং উমার (রাঃ) এর অধীনে অঞ্চলটি মুসলিমদের হয়ে যায়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ, বাইজেন্টাইনরা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে তাদের আধিপত্য হারায়। মুসলিম বাহিনীর ইয়ারমুক বিজয়ের কারণে গাজা, নাবলুস, লদ, ইয়াফা ও রাফাহসহ কুদসের অন্যান্য অঞ্চলও বিজিত হয়।

➤ বাইজেন্টাইন শাসনের পতন

- **৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিন:** ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনে বাইজেন্টাইন শাসনের পতন ঘটে এবং উমার (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ফিলিস্তিনের অধিকাংশ অংশ দখল করে নেয়। বিশেষ করে, জেরুজালেমের অধিকার মুসলিমদের হাতে আসে।

➤ জেরুজালেমের বিজয় ও আমান চুক্তি

দীর্ঘ ৪ মাস অবরোধের পর মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হন। তখন জেরুজালেমের বিশপ সফরোনিয়াস উমর (রা.) কাছে কুদসের চাবি প্রদানের শর্তারোপ করেন। অতঃপর উমর (রা.) নিজে ফিলিস্তিনে আগমন করেন এবং খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নিম্ন লিখিত দু'টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। যার মাধ্যমে তারা শহরটি শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের হাতে তুলে দেন।

- ১. খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন গির্জাঘর ও উপাসনালয় নিরাপত্তা পাবে।
- ২. এই পবিত্র শহরে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না। সেই ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র **'আহদিয়ায়ে উমরিয়্যাহ'** নামে বিখ্যাত।

➤ শাম ও ফিলিস্তিনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ফিলিস্তিন তখন শামের অংশ ছিল। উমর (রা.) শাসনামলে প্রশাসনিক ও ধর্মীয়ভাবে অঞ্চলটি পুনর্গঠিত হয়।

- শামের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন **আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ** (রা.), কিন্তু ১৮ হিজরীতে আমওয়াস মহামারিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

- পরবর্তীতে মুআয ইবনে জাবাল রা. গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনিও মহামারিতে ইন্তেকাল করেন। তারপর গভর্নর নিযুক্ত হন ইয়াযীদ ইবনু আবু সুফিয়ান রা.। তিনিও মহামারিতে ইন্তেকাল করেন। এরপর মুআবিয়া রা. গভর্নর নিযুক্ত হন। উসমান রা.-এর পুরো শাসনামল জুড়ে **মুআবিয়া রা.** গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।
- ১৯ হিজরীতে মুআবিয়া রা.-এর হাতে **কায়সারিয়া জয়ের মধ্য** দিয়ে গোটা ফিলিস্তিন মুসলমানদের হাতে চলে আসে। মুসলমানদের আগমনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

উসমান রা.-এর খেলাফতের শেষের দিকে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওসব ফিতনায় শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায় না। ফিতনার ওই সময়টাতে তাঁরা মুআবিয়া রা.-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন।

➤ জেরুজালেমে মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য

- জেরুজালেম বিজয় মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
- শহরের ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ধর্মীয় সহাবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়।
- উমর (রা.)-এর শাসনকালেই **আল-আকসা মসজিদ এবং ক্বিবলা মসজিদ (বর্তমানের আল-আকসা) পুণঃনির্মাণ** শুরু হয়।
- মুসলিম, খ্রিস্টান, এবং ইহুদিদের জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

উমার ইবনে খাত্তাব রা. এর খেলাফতে ফিলিস্তিনের বিজয়, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, প্রশাসনিক সংস্কার এবং জেরুজালেমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তার যুগান্তকারী অবদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৪. উমাইয়া খিলাফত

উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা

উমাইয়া শাসন (৬৬১-৭৫০): ফিলিস্তিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৬৬১ সালে হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রাজতান্ত্রিক খিলাফত হিসেবে উমাইয়া শাসনের সূচনা হয়। প্রথম খলিফা হিসেবে মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং দামেস্ককে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া শাসনের অধীনে ইসলামী সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন (আন্দালুসিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

➤ ফিলিস্তিনে উমাইয়া শাসন

উমাইয়া খিলাফতের অধীনে ফিলিস্তিন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় অঞ্চল হিসেবে উন্নত হয়। এই সময় ফিলিস্তিনে স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতোই কার্যকর ছিল।

➤ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

উমাইয়া শাসকরা ফিলিস্তিনে ইসলামি স্থাপত্য এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

- **ডোম অফ দ্য রক (কুব্বাত আশ-শাখরা):** এটি উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের অধীনে নির্মিত হয় (৬৮৮-৬৯১ খ্রিস্টাব্দ)। জেরুজালেমে অবস্থিত এই স্থাপত্যটি ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান এবং উমাইয়া শাসনের অন্যতম প্রতীক।

- **আল-আকসা মসজিদের উন্নয়ন:** ফিলিস্তিনের ধর্মীয় গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে এবং মুসলিমদের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আল-আকসা মসজিদ পুনর্গঠন করা হয়।

➤ প্রশাসনিক ও ভাষাগত পরিবর্তন উমাইয়া শাসনের অধীনে:

1. আরবি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

2. ইসলামি আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো কার্যকর করা হয়।

3. ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য ফিলিস্তিনকে একটি কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়।

➤ সামাজিক অস্থিরতা ও বিদ্রোহ

উমাইয়া শাসনের শেষদিকে আরব উপজাতিদের মধ্যে বিভাজন, কর ব্যবস্থায় অসন্তোষ এবং অমুসলিমদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে বিদ্রোহ শুরু হয়।

➤ উমাইয়া খিলাফতের পতন

৭৫০ সালে আব্বাসী বিপ্লবের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের অবসান ঘটে। তবে উমাইয়া পরিবারের একটি অংশ স্পেনে পলায়ন করে এবং সেখানে আল-আন্দালুস নামে একটি শক্তিশালী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

উমাইয়া শাসন ফিলিস্তিনের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশের একটি স্বর্ণযুগ ছিল। এই শাসনকাল ফিলিস্তিনকে ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, যা পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

৫. আব্বাসী খিলাফত

আব্বাসী খিলাফত (৭৫০-১২৫৮) ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসী খিলাফতের শাসনকালে, ফিলিস্তিনসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক অঞ্চলে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। নিচে আব্বাসী খিলাফতের ফিলিস্তিনে শাসনকাল সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

➤ আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠা

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে, আব্বাসী বংশ উমাইয়া খিলাফতকে পরাজিত করে খিলাফতের ক্ষমতা দখল করে। ১৩২-৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত ৫২৪ বছর এ খেলাফত স্থায়ী হয়। ১৩২-২৪৭ হিজরী পর্যন্ত ১১৫ বছর ছিল আব্বাসী খেলাফতের সোনালী যুগ।২৪৭-৬৫৫ হিজরী পর্যন্ত ৪০৯ বছর দুর্বলতার যুগ। উমাইয়াদের মতো আব্বাসীরাও ফিলিস্তিনকে খুব গুরুত্ব দিত। তবে সেটা উমাইয়াদের পর্যায়ে ছিল না।

আব্বাসী খিলাফতের প্রথম রাজধানী ছিল বাগদাদ (বর্তমান ইরাক), এবং এটি দ্রুত ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান, এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবে, আব্বাসী শাসনকালে ফিলিস্তিন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসেবে বিবেচিত, বিশেষত জেরুজালেম শহরের ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে।

➤ আব্বাসী শাসনে ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিন ছিল আব্বাসী খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। জেরুজালেমের ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে, এটি খিলাফতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

- **জেরুজালেমে উন্নয়নমূলক কাজ:** আব্বাসী শাসনকালে আল-আকসা মসজিদ এবং কুব্বাত আশ-শাখরার (ডোম অফ দ্য রক) সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা হয়। জেরুজালেমকে ইসলামী শিক্ষা এবং ধর্মীয় চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

- **ইসলামিক প্রশাসনিক কাঠামো:** ফিলিস্তিনে ইসলামি আইন এবং শাসন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। আরবি ভাষা প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

- **বাণিজ্য ও অর্থনীতি:** ফিলিস্তিন তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

➤ স্থানীয় শাসন এবং বিদ্রোহ

আব্বাসী শাসনের শেষের দিকে, কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ফিলিস্তিনে স্থানীয় শাসকদের আধিপত্য বেড়ে যায়।

- **তুলুনী শাসন (৮৬৮-৯০৫):** আব্বাসী গভর্নর আহমদ ইবনে তুলুন স্বাধীন হয়ে তুলুনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ২৬৪ হিজরী/৮৭৭ ঈসাব্দে তিনি ফিলিস্তিন অধিকার করেন। ফিলিস্তিন ৫৭ বছর তুলুনী রাজ্যের অধীনে ছিল। তার শাসনকালে ফিলিস্তিনে স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন ঘটে। ৩২১ হিজরীতে মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদীর হাতে তুলুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

- **ইখশীদী শাসন (৯৩৫-৯৬৯):** মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদ ফিলিস্তিনে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।৩৮ বছর ইখশীদীরা ফিলিস্তিন শাসন করেন। এ আমল ফিলিস্তিনের জন্য উত্তম শাসনামল বলে বিবেচিত হয়। ইখশীদী সুলতানেরা ফিলিস্তিনকে এতটাই গুরুত্ব দিত যে, কোনো খলীফার ইন্তেকাল হলে লাশ দাফন করতে মসজিদে আকসায় নিয়ে যেত। এতকিছুর পরও এ আমলে এসে ফিলিস্তিনে সামরিক ও দাওয়াতী কার্যক্রম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ৩৫৯ হিজরীতে ইখশীদীদের পতনের পর এসব দুর্বলতা ধরা পড়ে। ইখশীদী শাসনামলে জেরুজালেম এবং আল-আকসা মসজিদ বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

➤ আব্বাসী শাসনের পতনের সূচনা

১১শ শতকে আব্বাসী খিলাফত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে ফিলিস্তিন ক্রুসেডারদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ফিলিস্তিনে বিভিন্ন স্থানীয় শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করার চেষ্টা করেন, এবং এই কারণে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। ৯ম

শতকে, ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনেক বিদ্রোহ এবং সংঘর্ষ ঘটে, যার ফলে অঞ্চলটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে।

আব্বাসী খিলাফতের শাসনামলে ফিলিস্তিন ইসলামিক সংস্কৃতি, ধর্মীয় স্থাপত্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। তবে আব্বাসী শাসনের শেষ দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং স্থানীয় বিদ্রোহের কারণে ফিলিস্তিনের শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও এই সময়কাল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬.ফাতেমীয় শাসন/ শিয়া শাসন/ উবায়দীয়া শাসন

ফাতেমীয় শাসন ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ফাতেমীয় খিলাফত ছিল একটি **শিয়া মুসলিম রাজবংশ।** ফাতেমীয়রা নিজেদের বংশধর হিসেবে আলী ইবন আবু তালিব এবং তার স্ত্রী ফাতিমাহ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)'র কন্যার পরবর্তী বংশধরদের দাবী করতেন।

➤ ফাতেমীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা

ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে, যখন আল-মুহাদ্দির শাসনকালে তারা মিশর দখল করে এবং কায়রো শহরটি প্রতিষ্ঠা করে। ফাতেমীয় খিলাফত মূলত শিয়া ইসলামের সমর্থক ছিল এবং নিজেদেরকে আলী ইবন আবু তালিবের বংশধর হিসেবে দাবি করত। তাদের শাসনকালে, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ফিলিস্তিন, মিশর, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তারা এক শতকের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিন শাসন করলেও এই সময়কে ইসলামের ইতিহাসে **"অন্ধকার যুগ"** হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

➤ ফাতেমীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য

- **নিপীড়ন ও অত্যাচার:** সুন্নি মুসলিম আলেম ও উলামাদের হত্যা করা হয়, যার ফলে ফিলিস্তিনে সুন্নি ইসলামিক চিন্তাধারার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফাতেমীয় শাসনের সময় মিশর ও ফিলিস্তিনে ইসলামিক জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতির উপর মারাত্মক আঘাত আসে।
- **ফাতেমীয়দের ধর্মীয় বিভাজন:** ফাতেমীয় সাম্রাজ্যে দীর্ঘ ৬০ বছরের শাসক মুস্তানসির লিদীনিল্লাহ-এর আমলে ফাতেমীয়রা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়- **মুস্তালিয়া ও নিযারিয়া।**

➤ ফিলিস্তিনে ফাতেমীয় শাসন

ফাতেমীয়রা যখন ফিলিস্তিন শাসন করে, তখন ফিলিস্তিন ছিল তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ফাতেমীয় শাসকেরা ফিলিস্তিনের শহরগুলোতে প্রশাসনিক কাঠামো এবং ধর্মীয় অবকাঠামো গড়ে তোলে। বিশেষ করে জেরুজালেম শহরটি ছিল তাদের শাসনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ফাতেমীয়রা জেরুজালেমে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শহরের ইসলামিক স্থাপত্য এবং সংস্কৃতিতে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করেন।

- **জেরুজালেম এবং ইসলামিক স্থাপত্য**

ফাতেমীয় শাসনকালে, আল-আকসা মসজিদ এবং অন্যান্য ইসলামিক স্থাপত্যগুলোর সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ফাতেমীয়রা জেরুজালেমে ইসলামিক স্থাপত্যে নতুনত্ব আনেন এবং শহরের উন্নয়নেও বিশেষ মনোযোগ দেন। ফাতেমীয়দের সময়ে, তারা ইসলামিক শিক্ষার প্রচার এবং শিয়া ইসলামের প্রতিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেন।

ফাতেমীয় শাসকরা বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সহিষ্ণু নীতি গ্রহণ করেন, যার ফলে মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদি জনগণ একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে। এ সময় ফিলিস্তিনে ইসলামি সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে।

➤ **সালজুক সাম্রাজ্যের উত্থান ও ফাতেমীয়র পতন:**

৪৬৩ হিজরীতে, সুলতান আল্প আরসালানের নির্দেশে তুর্কী সেনাপতি আতসিয ইবনে উভাক ফাতেমীয়দের হাত থেকে ফিলিস্তিন মুক্ত করে। তবে, পরবর্তীতে এই সেনাপতি ফিলিস্তিনকে সেলজুক শাসনের আওতাধীন না রেখে আলাদা করে দেন। আল্প আরসালানের ছেলে তুতুশ ইতযিসকে পরাজিত করে, এবং তার সেনাপতি আরতুক ইবনে আকসাবকে ফিলিস্তিনের দায়িত্ব দেন।

➤ **আরতুকের শাসন ও ফিলিস্তিনের উন্নতি:**

৪৭১ থেকে ৪৮৯ হিজরী পর্যন্ত আরতুক ইবনে আকসাব ফিলিস্তিন শাসন করেন, এবং তার শাসনামল ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উন্নত সময়। দীর্ঘ সময় ধরে শাসনের মধ্যে অশান্তি ও দুঃশাসন থাকলেও, আরতুক ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি ফিলিস্তিনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন।

➤ **ফাতেমীয় খিলাফতের পতন**

সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি ফাতেমীয় খিলাফতকে পরাজিত করে মিশর ও ফিলিস্তিনে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সালাহউদ্দি আইয়্যুবির নেতৃত্বে, মুসলিমরা প্রথম ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করে এবং জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।

ফাতেমীয় খিলাফতের শাসনকাল ফিলিস্তিনে ইসলামী সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের শাসনের সময়, ফিলিস্তিনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শহরের ইসলামী স্থাপত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। তবে, ফাতেমীয় খিলাফত পতনের পর, সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির শাসনে ইসলামী বিশ্বের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

➤ ফাতেমীয়দের ফের দখল ও ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম:

৪৮৯ হিজরীতে, ৩ বছরের জন্য ফাতেমীয় মুস্তালিয়া ফেরকা ফিলিস্তিন দখল করে এবং সুকমান ইবনে আরতুক ও গাজী ইবনে আরতুককে ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কার করে। তারা তুরস্কের দক্ষিণে হিজরত করে এবং সেখানে আরতুক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েও ফাতেমীয়রা সুন্নী আলেমদের হত্যায় মেতে ওঠে। তাদের শাসনের বিপরীতে, আরতুক রাজ্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিশাল অবদান রাখে, যা ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ফাতেমীয় শাসনের অধীনে ফিলিস্তিনের ইতিহাস এক অন্ধকার যুগে প্রবেশ করেছিল, যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াত কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে, পরবর্তীতে সালজুক এবং আরতুক শাসকদের অধীনে ফিলিস্তিনে উন্নতি ও শান্তির নতুন অধ্যায় শুরু হয়, যা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. ক্রুসেডারদের কবলে ফিলিস্তিন: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

➤ ক্রুসেডারদের আগ্রাসন ও মুসলিম চেতনার দুর্বলতা

ফাতেমীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ক্রুসেডাররা আক্রমণ শুরু করে। ৪৯০ হিজরী/১০৯৭ ঈসাব্দে পাঁচটি বাহিনী ফ্রান্স থেকে কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। ক্রুসেডাররা প্রথমে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তারা খুব সহজে কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে। কারণ, তখন তিনি ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ব্যস্ত ছিলেন গাজী ইবনু দানেশমান্দকে পরাজিত করতে। তখন সালজুক সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তাছাড়া উবায়দী শিয়াদের দীর্ঘ গোমরাহীপূর্ণ শাসন মুসলিম চেতনাকে মিইয়ে দেয়। এসব কিছু ক্রুসেডারদের জন্য ফিলিস্তিন প্রবেশ সহজ করে দেয়।

➤ আলকুদসের পতন

৪৯২ হিজরী/৭ জুন ১০৯৯ ঈসাব্দে ক্রুসেডাররা আলকুদসে পৌঁছে। পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। ২০ শাবান ৪৯২ হিজরী/১৫ জুন ১০৯৯ ঈসাব্দে আলকুদসের পতন ঘটে। ক্রুসেডাররা ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে। পবিত্র শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ইহুদীদেরকে গির্জায় একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

➤ ক্রুসেড রাজ্যগুলোর প্রতিষ্ঠা

ক্রুসেডারদের আনাগোনায় এ পর্যায়ে এসে মুসলিম বিশ্বে কয়েকটি ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৯০ হিজরীতে রুহা রাজ্য, ৪৯১ হিজরীতের আন্তাকিয়া রাজ্য, ৪৯২ হিজরীতে বাইতুল মাকদিস রাজ্য, ৫০৩ হিজরীতে তারাবলুস ও তার আশপাশ মিলিয়ে আরেকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ মুহাররম ৫০৭ হিজরী/১১১৩ ঈসাব্দে ইরাকের বীর মওদুদ ইবনে তুনকাতিনের হাতে সিন্নাবরাহ রণাঙ্গনে ক্রুসেডাররা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধেই আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রখ্যাত বীর ইমাদুদ্দীন যেনকীর। তখন তার বয়স ২৪ বছর। তিনি এতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন।

➤ ইমাদুদ্দীন যেনকীর অবদান

ইমাদুদ্দীন যেনকী ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার পর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ৫৩০ হিজরী/১১৩৬ ঈসাব্দে লাযিকিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। অকল্পনীয় গনীমত লাভ করেন। এরপর একে একে তিনি মুসলিম বিশ্বে গজিয়ে ওঠা ক্রুসেড রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেন। এভাবে সূচিত হয় যেনকী সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ৫৪১ হিজরীতে তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হন। রেখে যান চার সন্তান।

➤ নুরুদ্দীন যেনকীর অবদান

নুরুদ্দীন যেনকী ও সাইফুদ্দীন গাজী বাবার অসমাপ্ত মিশন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন। ৫৪৫ হিজরী পর্যন্ত নুরুদ্দীন রাহ. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিজয় অর্জন করেন। ৫৪৮ হিজরীতে দুঃখজনকভাবে আসকালান ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। আসকালান ছিল

ফিলিস্তিনের একমাত্র স্বাধীন মুসলিম অঞ্চল। যদিও শাসকরা ছিল উবায়দী। তারা নুরুদ্দীন রাহ.-এর কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠায়। মাঝখানে প্রতিবন্ধক ছিল দামেশকের শাসক। তাই তিনি প্রথমে দামেশক জয় করেন। তিনি ফিলিস্তিন জয় করতে মিশরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সে ব্যবস্থাও করে দেন। উবায়দী শাসক আলআযিদ বিল্লাহ ২৭/২৮ বছর বয়সী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে মিশরের প্রধানমন্ত্রী বানান। তার ধারণা ছিল, তরুণ আইয়ুবীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর দৃঢ়তায় তার এ খায়েশ ভেস্তে যায়। তিনি ৫৬৭ হিজরী/১১৭১ ঈসাব্দে ২০৮ বছরের ওবায়দী শাসনের বিলুপ্তি ঘটান। উবায়দীরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে আতাত করে বহুবার মিশর দখল করতে চাইলেও তা ব্যর্থ হয়। এর মাত্র ২ বছর পর ১১ শাওয়াল ৫৬৯ হিজরীতে নুরুদ্দীন রাহ. দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

৮. আইয়্যুবিদ শাসন

আইয়্যুবিদ শাসন (১১৭১-১২৮৫) ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই শাসনামলটি বিশেষভাবে সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি এর নেতৃত্বে পরিচিত, যিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম ক্রুসেড এবং পরে দ্বিতীয় ক্রুসেড এবং ক্রুসেডারদের পুনঃআক্রমণ প্রতিহত করে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিশাল ঐতিহাসিক অর্জন লাভ করেন। আইয়্যুবিদ শাসন মূলত মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক অঞ্চল, বিশেষ করে ফিলিস্তিন, মিশর, সিরিয়া, এবং ইরাক অঞ্চল জুড়ে ছিল।

➤ আইয়্যুবিদ শাসনের প্রতিষ্ঠা

আইয়্যুবিদ শাসনের সূচনা হয় সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি (আবু-মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন) এর মাধ্যমে, যিনি ফাতিমিদ খিলাফত এর পতনের পর ১১৭১ সালে মিশর শাসন করেন এবং আইয়্যুবিদ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি, যিনি কুর্দি বংশধর ছিলেন, মিশর, সিরিয়া, ইয়েমেন, এবং ফিলিস্তিনসহ বৃহত্তর মুসলিম অঞ্চলকে একত্রিত করেন। তিনি একজন দক্ষ সামরিক নেতা এবং শাসক ছিলেন, যিনি ইসলামী সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করেন।

➤ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর উত্থান এবং আলকুদস পুনর্দখল

নউরুদ্দিন যেনকীর মৃত্যুর পর। সালাহউদ্দিন আইয়্যুবীর উত্থান ঘটে। ৫৬৭ হিজরী/১১৭১ ঈসাব্দে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী উবায়দীদের শাসন অবসান ঘটান। ৫৮৩ হিজরী/১১৮৭ ঈসাব্দে হিত্তীনের যুদ্ধে মাত্র ১২ হাজার মুসলমান ৬৩ হাজার ক্রুসেডারকে পরাজিত করে।

১৫ রজব ৫৮৩ হিজরীতে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আলকুদস অবরোধ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শহরের পাদ্রী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী টানা ১২ দিন মিনজানিক দিয়ে অব্যাহত আক্রমণ করে যান। হামলার ভয়াবহতা দেখে ক্রুসেডাররা শান্তি প্রস্তাব করে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমরা দীর্ঘ ৯২ বছর মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করেছ, আমি তোমাদের সাথে সে আচরণই করব।

ক্রুসেডাররা জবাবে বলে, আমরা আমাদের সন্তান, নারী ও পশুদের হত্যা করব। তারপর বাইতুল মাকদিস জ্বালিয়ে দেব। আমাদের হাতে বন্দি ৫ হাজার মুসলমানকেও জবাই করব। তারপর মরণপণ লড়াই করব।

এ জবাব শুনে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী দ্বিধায় পড়ে যান। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বাইতুল মাকদিস হস্তান্তরের পর জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ২৭ হিজরী রজব মাসে আলকুদস শহর মুসলমানদের হাতে আসে। ক্রুসেডাররা মসজিদে আকসাকে এতটাই অপরিচ্ছন্ন করেছিল যে, তা পরিষ্কার করতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এ বছর ঈদুল আযহা আল-কুদসে উদযাপন করেন।

৫৮৫ হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝিতে ক্রুসেডাররা গাই ডি লুসিগনানের নেতৃত্বে সুরের নিকটবর্তী শহর আক্কা অভিমুখে রওয়ানা করে। লুসিগনানকে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার শর্তে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আট মাস বন্দি রাখার পর মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং সুরে গিয়ে পরাজিত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়। ওয়াদা ভঙ্গের দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী খুবই ক্ষিপ্ত হন। তিনি আক্কায় পৌঁছার আগেই ক্রুসেডাররা আক্কায় পৌঁছে যায় এবং শহর অবরোধ করে। ক্রুসেডারদের কৌশলগত অবস্থান ও বিপুল শক্তিমত্তার দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ব্যর্থ হন। পূর্ণ দুই বছর অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

এর মধ্যে বাইতুল মাকদিসে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার জন্য ইউরোপে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়। এটা ছিল তৃতীয় বৃহত্তম ঐক্য। প্রথম ঐক্য ছিল প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সময়। যা খুবই সফল হয়েছিল। তাদের মাঝে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঐক্য হয়েছিল রুহা রাজ্যের পতনের পর। ক্রুসেডের এ অভিযান নুরুদ্দীন যেনকী ব্যর্থ করে দেন। এর কোনো ফলাফল ছিল না। আক্কা শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর ইয়াফা, আসকালান, কায়সারিয়া, আরসোফ, হাইফা ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়।

- জেরুজালেম ফিরে পাওয়ার পর, সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি শহরের মুসলিম, খ্রিষ্টান, এবং ইহুদি জনগণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন এবং সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য শহরটি পুনরায় উন্মুক্ত করে দেন। তিনি শহরের পবিত্র স্থানগুলো রক্ষার জন্য ব্যবস্থাও নেন, বিশেষত আল-আকসা মসজিদ এবং ডোম অফ দ্য রক, যা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান।

➤ আইয়্যুবিদ শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

আইয়্যুবিদ শাসকরা ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আল-আকসা মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপত্যে সংস্কার কাজ হয়।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মনোযোগ দেন এবং অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে বিশেষভাবে কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি তার শাসনকালে সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করেন এবং মিশর ও সিরিয়ায় নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করেন।

➤ **আইয়্যুবিদ শাসনের পতনের শুরু**

২৭ সফর ৫৮৯ হিজরীতে মহাবীর সালাহুদ্দীন আইয়্যুবী ইন্তেকাল করেন। সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির মৃত্যুর পর তার পরিবার ও বংশধরেরা শাসন করে, তবে আস্তে আস্তে শাসনব্যবস্থার শক্তি কমতে থাকে।

➤ **তৃতীয় ক্রুসেড এবং নতুন চ্যালেঞ্জ**

তাঁর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা চরম সংকটে নিপতিত হয়। ক্ষমতা নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মুসলমানদের বিবাদ-বিসংবাদের নয় বছর পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এর মধ্যে ক্রুসেডারদের হাতে বৈরুতের পতন ঘটে। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য দেখে ইউরোপীয়রা বিপদ আঁচ করতে পারে। ৫৯৯ হিজরী/১২০২ ঈসাব্দে **চতুর্থ ক্রুসেড** শুরু হয়। কিন্তু এ ক্রুসেড লক্ষভ্রষ্ট হয়। ক্রুসেডাররা আলকুদসের পরিবর্তে বাইজান্টাইনদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দিকে ধাবিত হয়। তারা বাইজান্টাইন সম্রাটকে হত্যা করে কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। তারা স্বজাতির ওপর হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়।

আদিল ৫৯৮-৬১৫ হিজরী পর্যন্ত মুসলিমবিশ্ব শাসন করেন। তিনি এ দীর্ঘ সময়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করেননি। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তৎপর হন। ফলে ৬১৫ হিজরীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় **পঞ্চম ক্রুসেড**। অভিযানের কথা শুনে আদিল মিশর ছেড়ে ফিলিস্তিন রক্ষার্থে ছুটে আসেন। ক্রুসেডারদের বিপুল সংখ্যার কথা শুনে তিনি সৈন্য সংগ্রহের জন্য দামেশকে যান। আদিলের মিশর ত্যাগের কথা জেনে ক্রুসেডাররা মিশরের প্রধান বন্দর দিময়াতে অবতরণ করে। এসময় দামেশকে আদিলের ইন্তেকাল হয়। মিশরজুড়ে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়। মানসূরার সীমান্তে ইসলামী শক্তি ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে কামিল ক্রুসেডারদের কাছে খুব অপমানকর এক প্রস্তাব পেশ করেন, ক্রুসেডাররা দিময়াত ছেড়ে চলে গেলে আলকুদসসহ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিজিত সব অঞ্চল তাদেরকে দিয়ে দেবন। তবে কামিলের একটি শর্ত ছিল, কার্ক ও শোবাক অঞ্চল এর বাইরে থাকবে। এজন্য পোপের প্রতিনিধি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের দরুন উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

এমন অপমানকর প্রস্তাবের পরও আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। পরাজয়ের মুখে ক্রুসেডাররা জান নিয়ে কোনোরকম বাড়ি যাওয়ার আকুতি জানায়। এভাবেই আল্লাহ সে সময় ফিলিস্তিনকে হেফাজত করেন।

৬২৪ হিজরীতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় সম্রাট ফেডারিকের নেতৃত্বে **ষষ্ঠ ক্রুসেড** পরিচালিত হয়। মাত্র ৫০০ যোদ্ধা নিয়ে সে অভিযানে বের হয় তারা। দুর্বলচিত্তের শাসক দ্বিতীয় কামিল তাকে প্রস্তাব দেয়, যদি যুদ্ধ না করে সে ফিরে যায় তাহলে তাকে আলকুদস দিয়ে দেওয়া

হবে। কামিল সত্যি সত্যিই ক্রুসেডারদের হাতে আলকুদস সোপর্দ করে। মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে ৬২৫হিজরী/১২৩৮ ঈসাব্দে ফেডারিক আলকুদস বুঝে নেয়।

তবে কামিল একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিল আলকুব্বাতুসা সাখরা ও আলআকসা মসজিদ তাদেরকে দেওয়া হবে না। কামিল ৬১৫-৬৩৫ হিজরী পর্যন্ত ২০ বছর শাসন করেন। সালহুদ্দীন আইয়ুবীর কুদস বিজয়ের ৪৩ বছর পর এই পতনের ঘটনা ঘটে। ৬৩৭ হিজরী/১২৩৯ ঈসাব্দে নাজমুদ্দীন আইয়ুব শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নেককার শাসক। তিনি সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজান। এসময় নাজমুদ্দীনের ভাতিজা ইসমাঈল দামেশকের ক্ষমতায় বসেন। সে ক্ষমতার জন্য হেন কোনো কাজ নেই করেনি। মিশর দখল করতে সে ক্রুসেডারদের সাথে হাত মেলায়।

৬৩৭ হিজরীতে নাসির দাউদ নিজস্ব বাহিনী নিয়ে আলকুদসে অভিযান চালান। তার এ অভিযান ইসলামের টানে ছিল না। সে শুধু নিজের সাম্রাজ্য গড়তে চেয়েছিল। সে ক্রুসেডারদের হাত থেকে আলকুদস ছিনিয়ে আনে। দ্বিতীয় কামিলের আলকুদস দিয়ে দেওয়ার ১১ বছর পর আবার ক্রুসেড শাসনের অবসান ঘটে। দাউদ আলকুদস দখল করতেই ইসমাঈল এসে হাজির হয়। সে আলকুদস তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দিতে চায়। বিনিময়ে সে পাবে মিশর দখলে ক্রুসেডারদের সহায়তা। এমনকি সে মসজিদে আকসা ও কুব্বাতুস সাখরাও দিয়ে দিতে রাজি হয়। ৬৩৮ হিজরী/১২৪০ ঈসাব্দে দ্বিতীয় বারের মতো আলকুদস ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

➤ মামলুকদের শাসন ও ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত পরাজয়

৬৪২ হিজরী/১২৪৪ ঈসাব্দে সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ুব আলকুদস পুনরুদ্ধার করেন। এরপর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সপ্তম ক্রুসেড পরিচালিত হয়। ৬৫৮ হিজরীর আইনুল জালুতের যুদ্ধে তাতারদের বিরুদ্ধে মামলুকরা ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। **সাইফুদ্দীন কালাউন এবং আশরাফ খলীল ক্রুসেড রাজ্যগুলো ধ্বংস করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।**

➤ ফিলিস্তিনে মুসলিম শাসনের অবসান

৬৯৩ বছর প্রায় সাত শতাব্দী ধরে আলকুদসে ইসলামী শাসন চললেও ১৩৩৫ হিজরী/১৯১৭ ঈসাব্দে ব্রিটিশ বাহিনী শহর দখল করে।

➤ নাজমুদ্দীন আইয়ুবের পরবর্তী পরিস্থিতি

নাজমুদ্দীন আইয়ুবের কুদস জয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্বে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়। ফরাসি সম্রাট নবম লুইসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক পোপ **সপ্তম ক্রুসেডের** ডাক দেন। এর ফলস্বরূপ ২ মুহাররম ৬৮৪ হিজরী/১২৫০ ঈসাব্দে ফারিস্কুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে ক্রুসেডাররা চরমভাবে পরাজিত হয়। নবম লুইস বন্দি হন এবং প্রায় ৩০ হাজার ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়।

➤ মামলুক শাসন ও তাতারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

নাজমুদ্দীন আইয়ুবের মৃত্যুর পর মিশরের ক্ষমতা নিয়ে মামলুকদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তবে, মামলুকদের শ্রেষ্ঠ শাসক সাইফুদ্দীন কুতুয ছিলেন এক অভাবিত নেতা। তিনি ৬৫৪ হিজরী/১২৬০ ঈসাব্দে গাজায় তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরে আইনুল জালুতের যুদ্ধে তাতারদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। ২৫ রমযান ৬৫৮ হিজরীতে মুসলমানরা ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে এবং তাতারদের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়।

➤ যহীরুদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্ব

সাইফুদ্দীন কুতুযের পর যহীরুদ্দীন বাইবার্স শাসন করেন। তিনি চার বছরের শাসন-ক্ষমতা গোছানোর পর ৬৬৩ হিজরীতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। একাধিক ক্রুসেড সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সফল লড়াই চালান।

➤ সাইফুদ্দীন কালাউন ও তার ক্রুসেড প্রতিরোধ

এর পর ক্ষমতায় আসেন সাইফুদ্দীন কালাউন। তিনি ৬৮৮ হিজরীতে ক্রুসেড রাজ্য তারাবলুস জয় করেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ৬৮৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র আশরাফ খলীল ক্ষমতায় আসেন এবং তিনি মুসলিম বিশ্বে গড়ে ওঠা অবশিষ্ট ক্রুসেডারদের উচ্ছেদ করেন।

➤ ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসন

মুসলিম শাসনাধীনে ইহুদীরা শান্তিতে বসবাস করছিল, যখন ৬৯০ হিজরী/১২৯০ ঈসাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ড ইহুদীদের দেশ ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছরেই ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফিলিপ একই ধরনের বিল পাশ করেন। ইহুদীরা তখন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে, যেটি ছিল মূলত তাদের নিপীড়ন থেকে মুক্তির উপায়। এই সময়েই **খ্রিস্টিয় জায়নবাদের** ভিত্তি তৈরি হয়।

➤ আইয়্যুবিদ শাসনের পতন

১২৮৫ সালে আইয়্যুবিদ শাসন শেষ হয়ে যায় এবং মমলুক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা মিশর এবং ফিলিস্তিনে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

➤ আইয়্যুবিদ শাসনের অবদান

আইয়্যুবিদ শাসন ফিলিস্তিনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। এই শাসনকালে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য এবং জেরুজালেমের পবিত্রতা পুনরুদ্ধারের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হয়। সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির নেতৃত্বে মুসলিমরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সমবায়ের মাধ্যমে ক্রুসেডারদের প্রতিহত করার পর, মুসলিম বিশ্বে তার জনপ্রিয়তা এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়।

আইয়্যুবিদ শাসন ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সময় ছিল। সালাহউদ্দিন আইয়্যুবি এবং ক্রুসেড ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে ইসলাম এবং খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সালাহউদ্দিন আইয়্যুবির নেতৃত্বে মুসলিম শক্তি নতুনভাবে জেগে ওঠে এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তার সাহসিকতা, নৈতিকতা, এবং ঐতিহাসিক অর্জন আজও মুসলিম বিশ্বে একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৯. মামলুক শাসন

মামলুক শাসন (১২৫০-১৫১৭) ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে মামলুকরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে মিশর এবং ফিলিস্তিন, শাসন করেছিল। মামলুকরা মূলত দাস বা গোলাম বাহিনী থেকে উঠে এসেছিল এবং তারা মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠা করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করে।

➤ মামলুকদের উত্থান

মামলুকরা আসলে তুর্কি এবং কুর্দি দাস ছিলেন, যারা মূলত আব্বাসি খিলাফত এবং পরে আয়ুবিদ শাসনের অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১২৫০ সালে, আয়ুবিদ শাসক তুতুস এর মৃত্যুর পর, মামলুকদের একজন নেতা শামসুদ্দিন ইলতুসমিশ মিশরের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে মামলুকরা মিশরে ক্ষমতা লাভ করে এবং মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

➤ ফিলিস্তিনে মামলুক শাসন

ফিলিস্তিন ছিল মামলুক শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফিলিস্তিনে মামলুকরা একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে তারা শহরগুলোতে ধর্মীয় ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

জেরুজালেম ছিল মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পবিত্র শহর এবং এটি মামলুক শাসনের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। মামলুকরা শহরের ধর্মীয় স্থানগুলো রক্ষার পাশাপাশি আল-আকসা মসজিদ এবং অন্যান্য ইসলামিক স্থাপত্যগুলোর সংস্কার ও পুনর্নির্মাণে মনোযোগ দেয়।

বাইতুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম) এবং হেবরন শহরও ছিল মুসলিম প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শহরগুলোতে মুসলিম শাসকরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় রেখেছিল এবং খ্রিষ্টান, মুসলিম, ইহুদি জনগণের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছিল।

➤ মামলুক শাসনের উন্নয়ন

মামলুকরা মিশর এবং ফিলিস্তিনে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করে, বিশেষ করে বাণিজ্য, শিক্ষা এবং স্থাপত্য ক্ষেত্রে। তাদের শাসনামলে, ফিলিস্তিনে বিভিন্ন মাদরাসা, সেতু, হাসপাতাল এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়।

- **সামরিক শক্তি:** মামলুক শাসকরা ছিলেন দক্ষ সেনাপতি এবং তাদের বাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। তারা কেবল ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই করেনি, বরং মঙ্গোল আক্রমণ এবং অন্যান্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

- **ধর্মীয় সহিষ্ণুতা:** মামলুকরা খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের প্রতি সহিষ্ণু নীতি অবলম্বন করেছিল, ফলে ফিলিস্তিনে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়।

➤ মামলুক শাসনের পতন

১৫১৭ সালে অটোমান সাম্রাজ্য ফিলিস্তিন এবং মিশর দখল করে, ফলে মামলুক শাসনের পতন ঘটে। অটোমানরা মামলুক শাসকদের পরাজিত করে এবং তাদের শাসন কাঠামোকে পুনর্গঠন করে।

➤ ফিলিস্তিনে মামলুক শাসনের উত্তরাধিকার

মামলুক শাসনের সময়ে ফিলিস্তিনে অনেক ইসলামিক স্থাপত্য এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটেছে, যার কিছু অবলম্বন আজও রয়েছে। আল-আকসা মসজিদ, দামেস্ক গেট, এবং অন্যান্য স্থাপত্যকর্মের সংস্কার ও নির্মাণের কারণে এই শাসনকাল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

মামলুক শাসন ফিলিস্তিনে ইসলামিক সভ্যতা, স্থাপত্য এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক গৌরবময় অধ্যায় ছিল। মামলুক শাসকদের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সামরিক শক্তির কারণে তারা মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে ফিলিস্তিন এবং মিশরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১০. অটোম্যান শাসন

অটোম্যান সাম্রাজ্য **১৫১৭** সালে মামলুক শাসন পরাজিত করে ফিলিস্তিনের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রায় ৪০০ বছর ধরে ফিলিস্তিন তাদের শাসনে ছিল।

➤ অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে ফিলিস্তিনের শাসন

- **১৫১৭** সালে অটোম্যান সেনাপতি সেলিম প্রথম ফিলিস্তিন দখল করেন।
- অটোম্যানরা ফিলিস্তিনকে শাম প্রদেশ বা সিরিয়া অঞ্চলের অংশ হিসেবে শাসন করে।
- তাদের শাসনকাল ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার যুগ।
- ফিলিস্তিনে ইসলামিক সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

➤ প্রশাসনিক শাসন এবং সংগঠন

- অটোম্যান সাম্রাজ্য ফিলিস্তিনকে তিনটি প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করে:

১. জেরুজালেম (জিল্কাদিয়া) – প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
২. নাবলুস – উত্তরাঞ্চলীয় অংশ।
৩. গাজার অঞ্চল – দক্ষিণাঞ্চলীয় অংশ।

- ফিলিস্তিনের প্রশাসনিক দফতরের কেন্দ্র ছিল জেরুজালেম, এবং এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শাসন ছিল। বিশেষ করে, ইসলামিক, খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়গুলো সুরক্ষিত ছিল এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আইন কার্যকর করা হতো।

➤ ধর্মীয় ভূমিকা ও জেরুজালেম

- জেরুজালেম ছিল তিনটি প্রধান ধর্মের পবিত্র শহর:

1. **ইসলাম:** আল-আকসা মসজিদ ও দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান।
2. **খ্রিস্টান:** হোলি সেপালচার চর্চা ও খ্রীষ্টের সমাধি।
3. **ইহুদী:** পশ্চিম প্রাচীর (ওয়েস্টার্ন ওয়াল) ও দ্বিতীয় মন্দিরের স্থান।

- ফিলিস্তিনে অটোম্যান শাসনের অধীনে ইসলামিক সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটে। অটোম্যানরা ফিলিস্তিনের বিভিন্ন মসজিদ, ধর্মীয় বিদ্যালয় (মাদ্রাসা), ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা (উফান) তৈরি করে।

- জেরুজালেম শহরটি ছিল মুসলিমদের দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান, আল-আকসা মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণে অটোম্যানরা কাজ করেছিল।

➤ অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, এবং ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন দখল করে। এই সময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলে ফিলিস্তিনের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনকে নিজেদের ম্যান্ডেট অঞ্চলে পরিণত করে এবং এখানকার শাসন ও আইনি কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য ফিলিস্তিনে এক দীর্ঘস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করে, যা শান্তিপূর্ণ coexistence এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে, যার ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী ইতিহাসে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

১১ . উসমানী খিলাফত

ফিলিস্তিনে উসমানী শাসন ছিল প্রায় ৪০০ বছরব্যাপী একটি দীর্ঘ শাসনকাল, যেখানে উসমানী সাম্রাজ্য মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি হিসেবে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিশর, এবং আরও অনেক অঞ্চল শাসন করেছিল। উসমানী শাসন ফিলিস্তিনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এবং এটি ইসলামী শাসনব্যবস্থার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

➤ উসমানী সাম্রাজ্যে ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্তি

১৫১৭ সালে মামলুক শাসন পতন হওয়ার পর, উসমানী সাম্রাজ্য ফিলিস্তিনকে দখল করে। মামলুকদের পরাজয়ের পর, উসমানী সুলতান সেলিম প্রথম (১৫১২-১৫২০) এর নেতৃত্বে উসমানী সাম্রাজ্য ফিলিস্তিনসহ মিশর, সিরিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের শাসন গ্রহণ করে। সেলিম প্রথমের বিজয়ের পর ফিলিস্তিন উসমানী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিণত হয়।

➤ ফিলিস্তিনের প্রশাসনিক কাঠামো

উসমানী শাসনকালে ফিলিস্তিন ছিল একটি প্রাদেশিক অঞ্চল, যা মূলত দামেস্ক (বর্তমান সিরিয়া) এর অধীনে পরিচালিত হত। ফিলিস্তিনের শাসনব্যবস্থা ছিল জেলা ভিত্তিক, এবং এটি উসমানী সুলতানের প্রাদেশিক গভর্নরের মাধ্যমে পরিচালিত হত। ফিলিস্তিনে মোট **৩**টি প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল:

- **জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস):** ফিলিস্তিনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে আল-আকসা মসজিদ এবং যিয়ারত স্থান ছিল। এটি উসমানী শাসনের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল।

- **গালিলি এবং নেবলুস:** এসব অঞ্চলও উসমানী প্রশাসনের অধীনে ছিল এবং এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **যাফা, আখি, এবং হেবরন:** এই শহরগুলোও উসমানী শাসনের অধীনে ছিল, এবং এদের বিভিন্ন ভূমিকা ছিল বাণিজ্যিক, ধর্মীয়, এবং সাংস্কৃতিক।

➤ উসমানী শাসনের প্রভাব

ফিলিস্তিনে উসমানী শাসন প্রভাব ফেলেছিল বিভিন্ন দিক থেকে:

- **আল-আকসা মসজিদ এবং ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর পুনর্নির্মাণ:** উসমানীরা জেরুজালেম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের ধর্মীয় স্থাপনার সংস্কার করেছিল।

- **ধর্মীয় শিক্ষা:** ফিলিস্তিনের মাদরাসাগুলোর সংখ্যা বাড়ে এবং ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। উসমানীরা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কলেজের (মাদরাসা) মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার করেছিল।

- **বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন:** ফিলিস্তিন উসমানী শাসনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ লাভ করে।

- **ধর্মীয় সহিষ্ণুতা:** উসমানী শাসন মুসলিম, খ্রিষ্টান এবং ইহুদিদের মধ্যে সহিষ্ণুতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

উসমানী শাসন ফিলিস্তিনের ইতিহাসে দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। উসমানী শাসকেরা ফিলিস্তিনে ইসলামিক স্থাপত্যের উন্নয়ন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ফিলিস্তিন পরিবর্তিত হয়ে যায়, যার পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নেয়।

➤ উসমানী খিলাফতের (মুসলমানদের) পতনের সূচনা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, উসমানী সাম্রাজ্য পরাজিত হয় এবং তার শাসক মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৪ সালে খেলাফত বাতিল করে দেন। ১৯০৯ সালে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ সুলতান আব্দুল হামীদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। নামকাওয়াস্তে খলীফার আসনে বসানো হয় পঞ্চম মুহাম্মাদকে। ব্যক্তিত্বহীন এ মানুষটি ছিল কেবলই খেলাফত বিলুপ্তির মাধ্যম। তার মন্ত্রীসভার

১৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৩ জনই ছিল ইহুদী। মন্ত্রীসভায় ইহুদীদের উপস্থিতির কারণে গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। এ অসন্তোষ কঠোর হাতে দমন করা হয়।

ইউরোপে ইহুদিদের নিপীড়ন ও উসমানী সাম্রাজ্যে ইহুদিদের আশ্রয়

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত সময়কালজুড়ে, ইহুদিরা ইউরোপে ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে উসমানী সাম্রাজ্যে আশ্রয় নেন, যা তুলনামূলকভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং নিরাপত্তার জন্য পরিচিত ছিল।

➤ **মধ্যযুগে ধর্মীয় বিদ্বেষ**

- **ক্রুসেড যুগ (১১-১৩শ শতক):** ক্রুসেড চলাকালে ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

- **কালো মৃত্যু (ব্ল্যাক ডেথ):** ১৪শ শতকের মহামারির সময় ইহুদিদের উপর এটি ছড়ানোর মিথ্যা অভিযোগ তুলে তাদের হত্যা করা হয়।

- **স্পেনের রিকনকুইস্তা (Reconquista):** ১৪৯২ সালে স্পেনের খ্রিষ্টান রাজারা ইহুদিদের দেশত্যাগ, ধর্মান্তর, অথবা মৃত্যুর শর্ত দেয়। এই সময় স্পেনের ইহুদি সম্প্রদায়, যাদের সেফার্দি ইহুদি বলা হয়, ব্যাপকভাবে বিতাড়িত হয়।

➤ **বিতাড়নের প্রধান ঘটনাবলী**

- **১২৯০:** ইংল্যান্ড থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন।

- **১৩৯৪:** ফ্রান্স থেকে বিতাড়ন।

- **১৪৯২:** স্পেন থেকে বিতাড়ন (আলহাম্ব্রা ডিক্রি)।

- **১৪৯৬:** পর্তুগাল থেকে ইহুদিদের বিতাড়ন।

ইহুদীদের অবান্তর দাবির সূচনা

ইউরোপ থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উসমানী খেলাফতে। দীর্ঘকাল তারা সেখানে বসবাস করে। ১০৩৫ হিজরী/১৬৩০ ঈসাব্দে ‘সাব্বাতাই জেভি’ নামে এক ইহুদীর জন্ম হয়। সে নিজেকে মাসীহ দাবি করে। তার পাশে ইহুদী-খ্রিস্টানরা জড়ো হতে থাকে। সে দুনিয়াকে ৩৮ ভাগে বিভক্ত করে ইহুদীদের ভাগ করে দেয়। সে ভবিষ্যদ্বাণী করে- খুব শিগগির তারা আপন আপন অঞ্চলের সম্রাট হয়ে যাবে।

সে একসময় উসমানী সাম্রাজ্য থেকে তার নিজের বণ্টন করা এলাকাগুলো দাবি করে বসে। এজন্য সে কিছু প্রতিবাদ সমাবেশ করে। প্রথম প্রথম প্রশাসন তাকে পাগল মনে করে এড়িয়ে গিয়েছিল। একপর্যায়ের তার দৃঢ়তা দেখে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগ মুহূর্তে সে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। সে ইহুদীদেরকেও ইসলাম গ্রহণ করতে বলে।

তারা মুসলিমের ছদ্মবেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেয়। ইউরোপে তারা যেমন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে ক্যাথলিক গির্জায় ঢুকে পড়ে, তেমনি উসমানী সাম্রাজ্যেও একই কাজ করে। তারা ডোনমে (ইহুদী ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন) আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা সেনাবাহিনীর উঁচু উঁচু পদগুলোতে ঢুকে পড়ে। তারা ‘ঐক্য ও প্রগতি সংঘে’ ঢুকে পড়ে। খেলাফত পতনে যাদের বড় ভূমিকা ছিল।

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান ও ফিলিস্তিনে আগমন

ফিলিস্তিন ও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এর ইতিহাস মূলত ১৭৯৯ সালের ইভেন্টগুলোর সাথে সম্পর্কিত, যখন নেপোলিয়ন তার মিশর অভিযান (১৭৯৮-১৮০১) এর সময় ফিলিস্তিন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন। ফিলিস্তিনে নেপোলিয়নের অভিযান সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি তার সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার একটি দৃষ্টান্ত। এই অভিযান মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসি সামরিক শক্তি প্রদর্শনের একটি প্রচেষ্টা ছিল।

➤ নেপোলিয়নের মিশর অভিযান

১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর আক্রমণ করেন, যার লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত করা এবং ব্রিটেনের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানো।

মিশরে বিজয়ের পর নেপোলিয়ন সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনে তার সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, কারণ তিনি ব্রিটিশ মিত্র ওসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন।

ফিলিস্তিনের উপকূলীয় শহরগুলো ছিল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলো নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর জন্য সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত।

➤ ফিলিস্তিনে অভিযান

নেপোলিয়নের ফিলিস্তিন অভিযান ১৭৯৯ সালে সংঘটিত হয় এবং এতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল:

১. জাফা অবরোধ (Battle of Jaffa): নেপোলিয়নের বাহিনী ১৭৯৯ সালের মার্চ মাসে ফিলিস্তিনের উপকূলীয় শহর জাফা (বর্তমান তেল আবিবের কাছে) আক্রমণ করে। জাফা অবরোধে নেপোলিয়নের বাহিনী বিজয়ী হয় এবং এটি একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা হিসেবে পরিচিত, কারণ তার সৈন্যরা হাজার হাজার উসমানী সৈন্য এবং শহরের অধিবাসীকে হত্যা করে। এছাড়া, বন্দী হওয়া উসমানী সৈন্যদের হত্যা করার জন্য নেপোলিয়ন ব্যাপক সমালোচনার শিকার হন।

২. জেরুজালেম অভিযান পরিকল্পনা: জেরুজালেম ছিল নেপোলিয়নের জন্য একটি ধর্মীয় ও কৌশলগত লক্ষ্য। তবে তিনি জেরুজালেম আক্রমণ না করে সিরিয়ার দিকে মনোযোগ দেন, কারণ তিনি প্রথমে আক্কা দখল করতে চেয়েছিলেন।

৩. আক্কা অবরোধ (Siege of Acre): আক্কা শহরের অবরোধ নেপোলিয়নের ফিলিস্তিন অভিযানে আক্কা শহরের অবরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। এখানে তিনি ইহুদীদের জন্য জাতিগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। ফরাসি বাহিনী প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়ায় ক্যাথলিক দেশগুলো, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও রাশিয়া, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি, উসমানী খেলাফতও নেপোলিয়নের কর্মকাণ্ডে বিচলিত ছিল। ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং উসমানী খেলাফত একত্রে নেপোলিয়নকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। উসমানী খেলাফত মিশর পুনরুদ্ধারের জন্য মুহাম্মাদ আলী পাশাকে সেনাপতি করে পাঠায়।

- **মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসনামলে ফিলিস্তিনে নির্যাতন**

মুহাম্মাদ আলী পাশার শাসনামলে ফিলিস্তিনীরা চরম দুঃখ-কষ্ট এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়। তিনি ফিলিস্তিনের ওপর অত্যধিক কর আরোপ করেন, যা জনগণের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে। যখন ফিলিস্তিনীরা প্রতিবাদ জানায়, তখন কঠোর দমন-পীড়ন চালানো হয়। ব্রিটিশরা তখন মুহাম্মাদ আলীর কাছে ফিলিস্তিনে একটি কনসাল নিয়োগ করার দাবি জানায়। এই কনসালের ভূমিকা ফিলিস্তিনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্রিটিশ রাজা তখন ইহুদীদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেন।

- **খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের শাসনামলে ইহুদী নিপীড়ন**

খলীফা দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের শাসনামলের শুরুতে (১৮৭৪-১৯০৯) রাশিয়ায় ইহুদী নির্যাতন চরমে পৌঁছায়। সেই সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সুলতান আব্দুল হামীদকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের গ্রহণ করতে বাধ্য করে। তবে সুলতান আব্দুল হামীদ খুব কঠোর অবস্থানে ছিলেন, এবং তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে বসবাস করবে না। এক সময় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হস্তক্ষেপ শুরু করেন, কিন্তু সুলতান আব্দুল হামীদ ঐতিহাসিকভাবে মন্তব্য করেন, **"যতদিন উসমানী খেলাফত থাকবে, ততদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীরা ঠাঁই পাবে না।"**

➤ **আক্কা দখলের ব্যর্থতা**

নেপোলিয়নের বাহিনী আক্কা শহর দখলের জন্য মাসব্যাপী প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু শহরটি দখল করা সম্ভব হয়নি। উসমানী গভর্নর জাজার পাশা এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সহায়তায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। নেপোলিয়নের এই পরাজয় মধ্যপ্রাচ্যে তার সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থতার সূচনা ছিল।

➤ **ফিলিস্তিনে নেপোলিয়নের প্রভাব**

নেপোলিয়নের ফিলিস্তিন অভিযান সামরিক দিক থেকে ব্যর্থ হলেও এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে:

- **কৌশলগত ব্যর্থতা:** ফিলিস্তিনের আক্কায় নেপোলিয়নের পরাজয় তার সামরিক অভিযানের গতিপথ বদলে দেয়। এটি প্রমাণ করে যে উসমানী সাম্রাজ্য এবং তাদের মিত্ররা এখনও শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম।

- **ইউরোপীয় আগ্রাসনের প্রতিরোধ:** নেপোলিয়নের পরাজয় ফিলিস্তিনে উসমানী সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **ইহুদিদের প্রতি বার্তা:** নেপোলিয়ন ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, যা আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্র ধারণার একটি প্রাথমিক উৎস হতে পারে। তবে এই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

➤ নেপোলিয়নের অভিযান ও এর সমাপ্তি

আক্কায় ব্যর্থ হওয়ার পর, নেপোলিয়নের বাহিনী মিশরে ফিরে যায়। তার সৈন্যদের মধ্যে প্লেগ এবং রসদ সংকটও অভিযান ব্যর্থ হওয়ার একটি কারণ ছিল। ১৮০১ সালে নেপোলিয়নের মিশর অভিযান সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়, এবং তিনি ফ্রান্সে ফিরে যান।

নেপোলিয়নের ফিলিস্তিন অভিযান সামরিকভাবে ব্যর্থ হলেও এটি মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় শক্তির আগ্রাসনের একটি প্রাথমিক দৃষ্টান্ত। এই অভিযান ফিলিস্তিনের কৌশলগত গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে। নেপোলিয়নের ফিলিস্তিন অভিযান পরবর্তীতে আরব এবং ইউরোপীয় সম্পর্কের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

ব্রিটেনের মিশর দখল

ব্রিটেনের মিশর দখল এবং ফিলিস্তিনে এর প্রভাব ছিল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১২৯৯ হিজরী/১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিশর দখল করে এবং এর ফলে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ প্রভাব ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিন সমস্যার জন্ম দেয়।

➤ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ কার্যক্রম

মিশর দখলের পর, ব্রিটেন ফিলিস্তিনে উসমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে তাদের প্রভাব বাড়াতে শুরু করে। মিশরকে রক্ষা করার জন্য, ফিলিস্তিনকে একটি সামরিক কৌশলগত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিন থেকে মিশরকে আলাদা করে ফেলা হয়, যা ব্রিটিশ সামরিক এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- **‘তুর্কী যুব সংঘ’ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা**

খলীফা আব্দুল হামীদের শাসনকালে **‘তুর্কী যুব সংঘ’** গড়ে ওঠে, যারা ছিল ফরাসি বিপ্লবের চেতনায় উজ্জীবিত। তারা ছিল ধর্মহীন। লালন করত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা। **‘ঐক্য ও প্রগতি’** নামে তাদের ছিল সামরিক ফ্রন্ট। উসমানী সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশকে তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। ডোনমে ইহুদীরাও তাদের সমর্থন দেয়। আরব বিশ্বেও তখন জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে।

হার্জেল নামক এক ইহুদী, যিনি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কাছে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লবিং করতে থাকে, সুলতান আব্দুল হামীদের কাছে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জমি দেওয়ার আবেদন করে, কিন্তু সুলতান তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে, হার্জেল রুশ সম্রাট জারের কাছেও গিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়। এর ফলে, তিনি উসমানী খেলাফত এবং রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন।

- **ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তার**

মিশর দখল ব্রিটেনকে মধ্যপ্রাচ্যে তার আধিপত্য বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। এই দখল ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ প্রভাব বাড়ানোর পথ সুগম করে। ব্রিটেনের মিশর ও ফিলিস্তিনে কার্যক্রম উসমানী সাম্রাজ্যের পতন এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- **আধুনিক সমস্যার ভিত্তি স্থাপন**

মিশর দখল, ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন বৃদ্ধি, এবং ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে সংঘর্ষের সৃষ্টি মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক সমস্যার ভিত্তি স্থাপন করে। ব্রিটেনের মিশর দখল এবং ফিলিস্তিনে এর প্রভাব তাই শুধু স্থানীয় পর্যায়ে নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও গভীর ছাপ রেখে গেছে, যা পরবর্তীতে ফিলিস্তিনে সংঘর্ষের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আকাবা বন্দর দখল

➤ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ফিলিস্তিনের প্রভাব

- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও উসমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতাঃ ১৯১৪-১৯১৮** সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। উসমানী সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পেছনে ঐক্য ও প্রগতি সংঘের ভূমিকা ছিল; তারা জার্মানির পক্ষে উসমানী খেলাফতকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করে। ইউরোপে উসমানী সেনাবাহিনীতে মড়ক দেখা দেয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধ চলাকালে ফিলিস্তিনে **১** লাখ উসমানী সৈন্য মোতায়েন ছিল, যা ফিলিস্তিনের কৌশলগত গুরুত্ব নির্দেশ করে। উসমানী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, যিনি পরবর্তীতে **১৯২৪** সালে খেলাফতের পতনের জন্য দায়ী হন।

➤ আকাবা বন্দর দখল

ফিলিস্তিনের আকাবা বন্দর দখল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, যা মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল। এটি ব্রিটিশ এবং তাদের মিত্র বাহিনী, বিশেষ করে আরব বিদ্রোহীদের, উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের অংশ ছিল। আকাবা বন্দরের দখল ফিলিস্তিন এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সামরিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

➤ আকাবা বন্দরের ভৌগোলিক গুরুত্বঃ

- আকাবা বন্দর (বর্তমান জর্ডানের অংশ) লোহিত সাগরের উত্তরে অবস্থিত একটি কৌশলগত বন্দর।
- এটি ফিলিস্তিনের দক্ষিণে এবং মিশরের সুয়েজ খালের নিকটে, যা ব্রিটিশদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক ও বাণিজ্যিক রুট ছিল।
- ওসমানী সাম্রাজ্য এই বন্দর ব্যবহার করে তাদের সামরিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করত।

১. আরব বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ পরিকল্পনা

ব্রিটিশরা শরীফ হুসাইন ইবনে আলিকে খুঁজে বের করে আরব ও তুর্কীদের মুখোমুখি করতে। **১৯১৫** সালে মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ম্যাকমোহন ও শরীফের মাঝে চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক শরীফ হুসাইন উসমানীদের অধীনে থাকা আকাবা বন্দর দখল করে নেবে, যেন ব্রিটিশদের ফিলিস্তিনে প্রবেশের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

১৯১৬ সালে, শরিফ হুসাইন এর নেতৃত্বে আরব বিদ্রোহ শুরু হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল উসমানী সাম্রাজ্য থেকে আরব ভূমি স্বাধীন করা। ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে, কারণ এটি উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করেছিল।

৩০ রজব **১৩৩৪/১** জুলাই **১৯১৬** সালে শরীফ আরব বিপ্লব কায়েম করেন। তার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল ছেলে ফয়সাল। সঙ্গে ছিল ইহুদী সামরিক অফিসার আরব লরেন্স।

২. টিএ ই লরেন্স (লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া) এর ভূমিকা

ব্রিটিশ গুপ্তচর এবং কূটনীতিক টিএ ই লরেন্স এই অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি আরব বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে সমন্বয় করেন এবং আকাবা বন্দরের দখলের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করেন।

৩. ১৯১৭ সালের আকাবা অভিযান

১৯১৭ সালের জুলাই মাসে, লরেন্স এবং বিদ্রোহী আরব বাহিনী ওসমানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আকাবা আক্রমণ চালায়। আকাবা মূলত সমুদ্রপথে সুরক্ষিত ছিল, তবে লরেন্সের বাহিনী মরুভূমি দিয়ে এসে আক্রমণ করে। উসমানীরা এই ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই অভিযানে উসমানী বাহিনীকে পরাজিত করা হয়, এবং আকাবা বন্দর ব্রিটিশ ও আরবদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

➤ **আকাবা দখলের প্রভাব**

- **ব্রিটিশ সামরিক কৌশলের উন্নতিঃ** আকাবা বন্দর দখলের ফলে ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন এবং সিরিয়ায় তাদের সামরিক অভিযানের জন্য একটি কৌশলগত বেস পায়। এটি ব্রিটিশ সেনাদের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে এবং ওসমানী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ফ্রন্ট দুর্বল করে।
- **আরব বিদ্রোহের শক্তিশালী ভূমিকাঃ** আকাবা দখল আরব বিদ্রোহের জন্য একটি বড় সাফল্য ছিল। এটি আরবদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আরও দৃঢ় করে।
- **ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নির্ধারণঃ** আরব-বাহিনী আকাবা বন্দর দখল করার মাধ্যমে ব্রিটিশদের ফিলিস্তিন প্রবেশের পথ সুগম হয়ে যায়। এর ফলে **১৯১৭** সালে জেরুজালেম দখল এবং পরে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এভাবে **ফিলিস্তিনে ইসলামিক আক্রমণ ও মুসলিম শাসনের সূচনা** ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের উপরই নয়, বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বে ইসলামের বিস্তারকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ ম্যান্ডেট

১৯১৭ সাল ছিল মুসলমানদের জন্য চরম বিপর্যয়ের। ২৫ অক্টোবর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সাত সদস্যের বিপ্লবী পরিষদের প্রধান লেলিন ছিল ইহুদী কার্ল মার্ক্সের আদর্শ লালনকারী। বাকি চারজন ছিল ইহুদী। পরিষদের সদস্য স্টালিন ইহুদী না হলেও তার স্ত্রী ছিল ইহুদী। বাকি একজন ছিল খ্রিস্টান। তাদের গঠন করা মন্ত্রী পরিষদের ২২ জনের ১৭ জনই ছিল ইহুদী। এ ছিল হার্জেলের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এর এক সপ্তাহ পর আসে বেলফোর ঘোষণা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর, **'ফিলিস্তিন লিগ অব নেশন্স'** এর অধীনে একটি ম্যান্ডেট অঞ্চল হিসেবে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন এবং আরব-ইহুদি সংঘর্ষের জটিল পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনে নিয়োজিত উসমানী সালতানাতের সেনাপতি মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে ফিলিস্তিন থেকে সরে যাওয়ার বিনিময়ে তুরস্কের সিংহাসনে বসানোর প্রলোভন দেয়। মুস্তফা কামাল সেই প্রলোভন ভালো করেই গলাধঃকরণ করে। একই বছরের ১৬ নভেম্বর বেলফোর ঘোষণার দুই সপ্তাহ পর ব্রিটিশ-বাহিনী **ফিলিস্তিন দখল** করে। কথামতে কামাল তুর্কী বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে। আরব-বাহিনী ছিল ব্রিটিশদের সহায়ক। তখন ফিলিস্তিনের বিপুল জনগোষ্ঠী কোথায় ছিল? আফসোস, তখন তারাও আরব জাতীয়তাবাদে বুঁদ হয়ে ছিল। তাদের মাথায় ঢোকানো হয়েছিল, ব্রিটিশরা এসে তাদেরকে উসমানীদের হাত থেকে রক্ষা করবে! তখন ফিলিস্তিনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, **'ইসলামী খ্রিস্টিয় যুব সংঘ'**। ফিলিস্তিনীদের মগজ ধোলাইয়ে এদেরও জঘন্য ভূমিকা ছিল। এদের কাছে অনেকেই তখন প্রতারিত হয়েছিল।

➤ ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের পটভূমি

- **উসমানী সাম্রাজ্যের পতন:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানী সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর, ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন দখল করে।

- **বেলফোর ঘোষণা (১৯১৭):** ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী **আর্থার বেলফোর** ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি **"জাতীয় আবাসভূমি"** প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘোষণা আরবদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে, কারণ তারা ফিলিস্তিনকে তাদের নিজস্ব ভূমি হিসেবে দাবি করত।

- **১৯২০** সালে **সান রেমো কনফারেন্সে** ফিলিস্তিন ব্রিটেনের ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করা হয়, এবং **১৯২৩** সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়।

➤ **বেলফোর ঘোষণা এবং ফিলিস্তিনে এর প্রভাব**

বেলফোর ঘোষণা ছিল **১৯১৭** সালের ২ নভেম্বর তারিখে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর কর্তৃক একটি চিঠি, যা ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি "জাতীয় আবাসভূমি" প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এটি ফিলিস্তিন এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

➤ **বেলফোর ঘোষণার পটভূমি**

1. **ব্রিটেনের কৌশলগত লক্ষ্যঃ**

- ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি সম্প্রদায়ের সমর্থন পেতে চেয়েছিল, বিশেষ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার ইহুদি জনগোষ্ঠীর।

- ব্রিটেন ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে জোট গড়ে ফিলিস্তিনে তাদের সামরিক ও কৌশলগত প্রভাব শক্তিশালী করতে চেয়েছিল।

2. **বিশ্ব ইহুদি আন্দোলনঃ**

- ১৯ শতকের শেষভাগে শুরু হওয়া **জায়নিস্ট আন্দোলন** ইহুদিদের ঐতিহাসিক পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিল।

- এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন **থিওডর হার্জল**, এবং বিশ্বজুড়ে ইহুদি জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফিলিস্তিনে অভিবাসনের জন্য কাজ করছিল।

3. **সাইক্স-পিকো চুক্তি (১৯১৬):**

- এর আগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোপন **সাইক্স-পিকো** চুক্তির মাধ্যমে উসমানী সাম্রাজ্যের আরব ভূমিগুলো ভাগাভাগি করেছিল।

- এই চুক্তি অনুসারে, ফিলিস্তিন একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বেলফোর ঘোষণা সেই পরিকল্পনা পাল্টে দেয়।

➤ **বেলফোর ঘোষণার বিষয়বস্তু**

বেলফোর ঘোষণা ছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি চিঠি, যা ইহুদি নেতা লর্ড রথসচাইল্ডের কাছে পাঠানো হয়। এর মূল বক্তব্য ছিল:

"ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করছে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবে, তবে এমনভাবে যে ফিলিস্তিনের অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।"

বেলফোর ঘোষণা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি গভীরতর পরিবর্তনের সূচনা করে। এটি একদিকে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়, অন্যদিকে ফিলিস্তিনে আরব-ইহুদি সংঘাতের বীজ বপন করে।
ফিলিস্তিন ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে এর প্রভাব আজও টিকে আছে, যা রাজনৈতিক ও মানবিক সংকটের রূপ নিয়েছে।

ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের শাসনব্যবস্থা

১৯২০ সালে লিগ অফ নেশনস ব্রিটেনকে ফিলিস্তিনের ম্যান্ডেট প্রদান করে, যেখানে বেলফোর ঘোষণার নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন ইহুদি ও আরবদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করলেও, তাদের নীতিগুলো ইহুদিদের পক্ষে ঝুঁকেছিল।

➤ **ইহুদীকরণ প্রকল্পের সূচনা**

এরপর ১৯১৮-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে চলে ইহুদীকরণ প্রকল্প। বেলফোর ঘোষণার পর ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের ইহুদিরা, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ থেকে বিপুলসংখ্যক ইহুদি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে।

- **১৯১৭** সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীরা ছিল ৮%। **১৯৪৮** সালে গিয়ে দাঁড়ায় **৩২%**।

- **১৯২০** থেকে **১৯৩৯** সালের মধ্যে প্রায় **৪,৫০,০০০ ইহুদি** অভিবাসী ফিলিস্তিনে চলে আসে।

- তারা নানা ছলচাতুরি, প্রলোভন ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে জমি ক্রয় করতে শুরু করে। এত কিছুর পরও ইহুদীরা কেবল **১%** জমি ক্রয় করতে পেরেছিল। ইহুদীরা ফিলিস্তিনের অর্থনীতিতে মারাত্মক আধিপত্য বিস্তার করে।

➤ **আরব বিদ্রোহঃ আরব-ইহুদি সংঘাতের সূত্রপাত**

- ফিলিস্তিনের স্থানীয় আরবরা, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, বেলফোর ঘোষণাকে তাদের ভূমি এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে দেখেছিল। তারা এটি একটি উপনিবেশবাদী ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে।

- ফিলিস্তিনের আরবরা ব্রিটেন ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। **১৯২০, ১৯২১, এবং ১৯২৯ সালের দাঙ্গা** এর উদাহরণ।

- **ইহুদি প্রতিরোধ গোষ্ঠী:** ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে ইহুদি গোষ্ঠীগুলিও বিদ্রোহ করতে শুরু করে। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ছিল **হাগানাহ, ইরগুন, এবং লেহি,** যারা পরবর্তীতে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভিত্তি গড়ে তোলে।

➤ ব্রিটিশ নীতি ও সংকট

- ব্রিটিশ প্রশাসন ফিলিস্তিনে আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষের সমাধান করতে ব্যর্থ হয়।
- **১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্র:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন একটি নীতি চালু করে, যেখানে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন সীমিত করা হয়। এটি ইহুদি গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করে, কারণ তারা ইউরোপের নাৎসি নিপীড়নের কারণে পালিয়ে আসছিল।
- ব্রিটেনের এই নীতিগত দোদুল্যমানতা আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়িয়ে দেয়।

➤ ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সমাপ্তি

ব্রিটিশ প্রশাসন ফিলিস্তিনে শান্তি স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে ফিলিস্তিন থেকে তাদের শাসন প্রত্যাহার করে। এই সময়ে **ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা** ঘটে এবং **আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ** শুরু হয়।

➤ ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের প্রভাব

- **আরব-ইহুদি সংঘর্ষ:** ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সময়েই আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে যায়, যার ফলে আধুনিক ফিলিস্তিন সংকট সৃষ্টি হয়।
- **ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা:** ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সময়কাল ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে।
- **আরব পরিচয়ের সংকট:** ফিলিস্তিনি আরবদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং তারা শরণার্থী হয়ে ওঠে।

ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট একটি বিভক্ত এবং সংঘাতপূর্ণ অধ্যায়, যা আরব-ইসরায়েল সংঘাতের ভিত্তি স্থাপন করে। ব্রিটিশ শাসনের সময়কাল ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন আনে, যার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

ফিলিস্তিনীদের মুক্তি-সংগ্রাম

ফিলিস্তিনীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে। **১৯১৯** থেকে **১৯৩৩** সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চলে। তবে, ব্রিটিশদের দমননীতি এবং রাজনৈতিক প্রতারণার কারণে এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ফলপ্রসূ হয়নি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ব্যর্থতা ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ধাবিত করে।

➤ সশস্ত্র জিহাদের সূচনা

১৯৩৩ সালে ফিলিস্তিনে প্রথমবারের মতো সশস্ত্র জিহাদের সূচনা হয়। সিরিয়ান নাগরিক **ইযযুদ্দীন কাসসাম রাহ.**-এর নেতৃত্বে এই জিহাদ শুরু হয়। তাঁর নামে পরবর্তীতে **কাসসাম ব্রিগেড** গঠিত হয়। দীর্ঘদিন গোপনে সুসংগঠিত হওয়ার পর এই জিহাদি কাফেলা সামরিক অভিযান শুরু করে। ইযযুদ্দীন কাসসাম রাহ. শহীদ হলে নেতৃত্বে আসেন ফারহান সাদী, যিনি ৮০ বছর বয়সে রোযা অবস্থায় শহীদ হন।

➤ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও ব্রিটিশদের বিপর্যয়

১৯৩৬ থেকে **১৯৩৯** সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মুজাহিদ বাহিনী ব্যাপক সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

- **১৯৩৬:** ৫০৬টি কমান্ডো অভিযান।
- **১৯৩৮:** ৫৭০৮টি অভিযান।
- **১৯৩৯:** ৩৩১৫টি অভিযান।

এই সময় মুজাহিদদের হাতে **১০** হাজার ব্রিটিশ সেনা প্রাণ হারায়। অন্যদিকে **১২** হাজার ফিলিস্তিনি শহীদ হন এবং ৫০ হাজার বন্দি হন। এমন প্রতিরোধের মুখে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করার পরিকল্পনা থেকে সরে আসে এবং একটি **স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি** দেয়।

➤ ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি ও মুসলিমদের প্রতারণা

ব্রিটিশদের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল, যা ফিলিস্তিনিদের প্রতারিত করে। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফিলিস্তিনিদের জিহাদি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তবে, এই আন্দোলন ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

ইহুদীকরণ প্রকল্পের দ্বিতীয় স্তর

➤ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আগমন

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদীরা "নির্যাতনের শিকার" হওয়ার অজুহাতে ফিলিস্তিন অভিমুখে ব্যাপক হারে আগমন শুরু করে। এ সময়ে **৯০ হাজারেরও বেশি ইহুদী** ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। মানুষের সহানুভূতি অর্জনের জন্য তারা হলোকাস্টের গল্প প্রচার করে এবং **দাবি করে যে হিটলার ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করেছে।** তবে, সমসাময়িক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেই সময় ইহুদীদের মোট সংখ্যা এত বেশি ছিল না। রাষ্ট্রহীন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা জাতিসংঘে নিজেদের নামে প্রতিরক্ষা ইউনিট গঠন করে, যা তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ ছিল।

➤ আমেরিকার উত্থান ও ব্রিটিশদের পতন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে একটি পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এদিকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন সূচিত হয়। ইহুদীরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশদের ছেড়ে আমেরিকার সঙ্গে জোট বাঁধে। ব্রিটিশদের প্রতি তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ এখানে আবারও প্রমাণিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ (১৯৪৮)

১৯৪৮ সালে, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসানের পর, ইহুদি নেতারা ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা আরব দেশগুলো এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। ১৯৪৮ সালের প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু শতাধিক হাজার ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে পড়ে।

ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

➤ ঔপনিবেশিক ইতিহাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অধীনে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইহুদিদের স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, ফিলিস্তিনে সংঘর্ষ চরমে পৌঁছে যায়। ইহুদি গোষ্ঠীগুলি ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দেয়, এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি তাদের বিদ্রোহ শুরু হয়।

➤ ইঙ্গ-মার্কিন জোট ও ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ

১৯৪৬ সালে ইহুদীদের সহযোগিতায় ইঙ্গ-মার্কিন জোট গঠিত হয়। এই জোট ফিলিস্তিনকে ঘিরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করে:

- ১. এক লক্ষ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২. ফিলিস্তিনে জমি কেনার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
- ৩. ফিলিস্তিনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করতে হবে।

এই দাবিগুলো ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা পরিবর্তনের একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছিল, যা পরবর্তীতে ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

➤ জাতিসংঘের বিভক্তি প্রস্তাব ও আরবদের প্রতিক্রিয়া

আরবদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ফিলিস্তিন সমস্যাটি জাতিসংঘের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন বিভাজন পরিকল্পনা (United Nations Partition Plan) ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী,

- ফিলিস্তিনকে **দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত** করার পরিকল্পনা হয়—একটি **ইহুদি রাষ্ট্র** এবং একটি **আরব রাষ্ট্র**।এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক শহর হিসেবে আলাদা রাখা হবে।
- ইহুদীরা জনসংখ্যার মাত্র ৩২% হওয়া সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের ৫৬.৫% ভূখণ্ড পাবে,
- আর ফিলিস্তিনিরা ৪৩% পাবে।
- বাকি ০.৫% আল-কুদস আন্তর্জাতিক অঞ্চলের অধীনে রাখা হবে।

- ইহুদিরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি এবং প্যালেস্টিনীয়রা এর বিরোধিতা করে।

এ প্রস্তাব কার্যকর হলে আরব লীগ দ্রুত প্রতিরোধের জন্য বৈঠক ডেকে স্যালভেশন আর্মি গঠন করে। কিন্তু এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় সন্দেহজনক এক ব্যক্তি ফাওজী কাউকজীকে।

➤ আরব লীগের ব্যর্থতা

স্যালভেশন আর্মির জন্য এক মিলিয়ন পাউন্ড বাজেট বরাদ্দ করা হয় এবং দামেশকের কাতনায় একটি প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। এই সংবাদ শুনে ব্রিটেন আরবলীগের কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠায়, 'ফিলিস্তিনীদের প্রশিক্ষণ, সশস্ত্রীকরণ ব্রিটেন বন্ধুত্ব পরিপন্থি মনে করে।' এতেই আরবলীগ ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের বের করে দেয়। স্যালভেশন আর্মির সংখ্যা ৭৭০০ তে নামিয়ে আনে। অথচ ইহুদী সশস্ত্র সংগঠন এক হাগানারই সদস্য সংখ্যা ছিল তখন ৬২ হাজার! আরবলীগের এমন সিদ্ধান্তে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ১৯৪৫ সালে আরবলীগের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ব্রিটেনের ইন্ধনে।

➤ আব্দুল কাদের হুসাইনীর নেতৃত্বে গণআন্দোলন

এরপর আব্দুল কাদের হুসাইনীর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে একটি গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লেও ব্রিটিশ উপনিবেশের দমননীতি এবং মুসলিম দেশগুলোর দুর্বলতার কারণে তা তেমন কার্যকর হয়নি। কেবলমাত্র ইখওয়ানুল মুসলিমীন সক্রিয়ভাবে ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করে।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৮)

১৯৪৮ সালের ১২ মে রাত ১২টা এক মিনিটে ডেভিড বেন গুরিওন (ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী)
ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করে। ওই রাতের **১২:১০** মিনিটেই যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশ ধাপে ধাপে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে।আর তখন থেকেই শুরু হয় ইহুদিদের তাণ্ডবলীলা।

এই ঘোষণার পরপরই শুরু হয় প্রথম **আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ** (যাকে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধও বলা হয়)। এটি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং ফিলিস্তিনীয়দের জন্য একটি ট্রাজেডি হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা যাক:

➤ প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ:

প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ (**১৯৪৮**), যেটি **"স্বাধীনতা যুদ্ধ"** (War of Independence) এবং "নাকবা" (Nakba) বা **"বিপর্যয়ের দিন"** নামে পরিচিত, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এটি **১৪** মে **১৯৪৮** সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণার পর শুরু হয় এবং **১৯৪৯** সালের প্রথম দিকে সমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধটি **ইসরায়েল এবং পাঁচটি আরব দেশের** মধ্যে সংঘটিত হয়, যা পরবর্তীতে আরব-ইসরায়েল সংঘাতের একটি দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা করে। এরা একসঙ্গে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ চালায়, তবে দ্রুতই ইসরায়েলের সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

এই যুদ্ধটি প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলি পক্ষের জয়লাভের দিকে অগ্রসর হয়, এবং তারা বহু আরব অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধটি **১৫ মে ১৯৪৮** থেকে **১০ মার্চ ১৯৪৯** পর্যন্ত চলেছিল।

➤ **যুদ্ধের ঘটনাবলী:**

১. আরব দেশগুলির আক্রমণ:

১৪ মে ১৯৪৮ তারিখে, ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই, মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক এবং লেবানন—এই পাঁচটি আরব দেশ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। তারা প্যালেস্টাইন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায়, কিন্তু ইসরায়েলের আধুনিক এবং ভাল সজ্জিত সেনাবাহিনী তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়।

২. যুদ্ধের পরিস্থিতি:

- **প্রাথমিক আক্রমণ:** আরব বাহিনীর আক্রমণ প্রথম দিকে কিছুটা সফল হলেও, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইসরায়েল দ্রুত তাদের আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, এবং কিছু অঞ্চলে তারা আরব বাহিনীকে পিছু হটাতে সক্ষম হয়।

- **পশ্চিম তীর এবং গাজার দখল:** ইসরায়েল পশ্চিম তীর (যা তখন জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে ছিল) এবং গাজা উপত্যকা (যা মিশরের নিয়ন্ত্রণে ছিল) আক্রমণ করে এবং কিছু অঞ্চলে বিজয় লাভ করে।

- **গোলান Heights দখল:** ইসরায়েল গোলান Heights দখল করে নেয়, যা পরবর্তীতে সিরিয়া এবং ইসরায়েলের মধ্যে একটি বিতর্কিত এলাকা হয়ে ওঠে।

৩. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও আরব লীগের নিষ্ক্রিয়তা

যুদ্ধের প্রাথমিক সময়গুলিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই ইসরায়েলকে সমর্থন জানিয়েছিল, তবে আরব দেশগুলিও তাদের নিজস্ব সমর্থক দেশগুলোকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধ করতে একাধিক চেষ্টা করলেও, যুদ্ধটি কয়েক মাস স্থায়ী হয়।

- **১৯৪৮** সালের ৩ এপ্রিল আল-কাস্তাল শহর অবরোধের সময় ফিলিস্তিনি বাহিনী আরব লীগের কাছে অস্ত্র চায়, কিন্তু কোনো সাড়া মেলে না। ব্রিটিশ বাহিনী ফিলিস্তিন ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আরব বাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে একের পর এক শহর ইহুদীদের হাতে চলে যায়।

- **১৯৬৭** সালে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু মাত্র **ছয় দিনের মাথায় জাতিসংঘ শান্তির আহ্বান জানায়**। আরব দেশগুলো প্রতারণাপূর্ণ এই শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়, যার ফলে পরিস্থিতি পুরোপুরি ইহুদীদের পক্ষে চলে যায়।

➤ **যুদ্ধের ফলাফল:**

- **ইসরায়েলের বিজয়: ১৯৪৯** সালে যুদ্ধের পর, একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইসরায়েল প্রায় ৭৭% প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড দখল করে নেয়। পশ্চিম তীর এবং গাজা ইরাক ও মিশরের নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু ইসরায়েল আন্তর্জাতিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত হয়।

- **ফিলিস্তিনীয় শরণার্থী সংকট:** যুদ্ধের ফলস্বরূপ, প্রায় ৭ লাখ প্যালেস্টিনীয় তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বিতাড়িত হয় বা পালিয়ে যায় এবং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিসর এবং অন্যান্য আরব দেশে আশ্রয় নেয়। এই ঘটনাকে

ফিলিস্তিনিরা **"নাকবা"** (নাকবা মানে "বিপর্যয়" বা "দুঃখের দিন") বলে আখ্যায়িত করে।

শরণার্থীদের অধিকাংশই দীর্ঘকাল ধরে আশ্রয় শিবিরে বসবাস করছে। শরণার্থী শিবিরগুলোতে বসবাসকারী ফিলিস্তিনীয়দের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কষ্টকর, যেখানে বেকারত্ব, দরিদ্রতা এবং মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা প্রবল। শরণার্থীদের বেশিরভাগই তাদের ভূমিতে ফিরতে পারেনি। এদের মধ্যে অনেকে তাদের ভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য বহু বছর ধরে সংগ্রাম করে আসছে। যা ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সংকটের একটি প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- **বিভিন্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ:** ইসরায়েল, যুদ্ধের শেষে, পশ্চিম তীর, গাজা, গোলান Heights এবং পূর্ব জেরুসালেমের কিছু অংশ দখল করে নেয়। যদিও জাতিসংঘের বিভাজন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে দুটি রাষ্ট্রে ভাগ করার কথা ছিল, ইসরায়েল পরবর্তীকালে অধিকৃত এই অঞ্চলগুলোতে ইহুদি বসতি স্থাপন শুরু করে। তবে, যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলগুলো নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে ওঠে।

➤ একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু

আরব লীগের ভুল সিদ্ধান্ত, অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে ফিলিস্তিনের মুক্তির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। ইহুদীরা কৌশলে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং সেখানে নিজেদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুসংহত করে।

ফিলিস্তিনের অপমৃত্যু: আরব শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত

➤ জাতিসংঘ মহাসচিবের হত্যাকাণ্ড

ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আসেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ফোক বার্নাডট। তিনি **১৯৪৮** সালের **১৬** সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ফোক বার্নাডট ফিলিস্তিনের প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরেন। আর পরদিন, **১৭ সেপ্টেম্বর, ইহুদী সশস্ত্র গোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করে**। এই ঘটনা ইসরাইলি সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের একটি নজির হয়ে রয়েছে।

➤ আরব-বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা

আরব-বাহিনী মুজাহিদদেরকে ফিলিস্তিন থেকে বের করে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে পৌঁছতেই নিরাপত্তাবাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার করে। আরব-বাহিনী সেসব এলাকাতেই অভিযান চালায়, যেগুলো জাতিসংঘ ইসরাইলের ভাগে দিয়েছিল। আরব-বাহিনী সেসব এলাকা থেকে মুজাহিদদের হটিয়ে ইহুদীদের জন্য দখল করার পথ সুগম করে দিত।

➤ ফিলিস্তিনিদের বিতাড়ন

জাতিসংঘের রায়ের পর ফিলিস্তিনীরা **গাজা** নামক শহরের উপকণ্ঠ উত্তর-দক্ষিণে বসবাস শুরু করে। আর ইহুদিরা ফিলিস্তিনের **উত্তর-পশ্চিমে** বসবাস করতে শুরু করে।

যেহেতু উত্তর-পশ্চিমের তাদের বসবাসের সীমানা নির্ধারিত ছিল না, তাই তারা মুসলমানদের সেখান থেকে সমূলে বিতাড়িত করে ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতি করত। কখনো কখনো পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে রাখত।

যার ফলে অসংখ্য ফিলিস্তিনীরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আরব দেশগুলোর ষড়যন্ত্রের ফলে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার ফিলিস্তিনীকে বিভিন্ন আরব দেশে বিতাড়িত করা হয়। এ সময় **ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রধান হাসানুল বান্না গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হন।** এটি মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য এক বিশাল আঘাত ছিল। আর ইসরায়েল বাহিনী এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের সীমানা বাড়িয়েই চলছিল।

➤ আরব-ইসরাইল যুদ্ধবিরতির চুক্তি

১৯৪৯ সালে ইসরাইল মিশরের সাথে ২৪ ফেব্রুয়ারি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়। এরপর ২৩ মার্চ লেবাননের সাথে, ৪ এপ্রিল জর্ডানের সাথে এবং ১ এপ্রিলের পর সিরিয়ার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিনের বাকি ২২% ভূখণ্ড মিশর ও জর্ডানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। পশ্চিম তীর চলে যায় জর্ডানের অধীনে, আর গাজা নিয়ন্ত্রণে নেয় মিশর।

➤ ইসরাইলের বৈশ্বিক স্বীকৃতি

আরব-ইসরাইল যুদ্ধবিরতির পর জাতিসংঘ ইসরাইলকে সদস্যপদ প্রদান করে। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একের পর এক জায়নবাদী এই রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দেয়। আরব শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে ফিলিস্তিনিরা নিজ ভূমি হারিয়ে শরণার্থী হয়ে পড়ে।

ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গভীর সংকটের সূচনা করে। এই যুদ্ধ ইসরায়েলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে চূড়ান্ত করলেও, ফিলিস্তিনিদের জন্য শরণার্থী সংকট ও ভূমি হারানোর মর্মান্তিক অধ্যায় সৃষ্টি করে। যুদ্ধ পরবর্তী এই মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট আরব-ইসরায়েল সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে রূপ দিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের অধিকার ও শরণার্থী সমস্যার সমাধান আজও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ফিলিস্তিন মুক্তির আন্দোলন

ফিলিস্তিন মুক্তির আন্দোলন এক দীর্ঘ এবং জটিল ইতিহাসের অংশ, যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলছে। এটি মূলত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য একাধিক রাজনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক সংগ্রামের সমন্বয়।

➤ ফিলিস্তিনির প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর, ফিলিস্তিনীয়দের অধিকাংশই তাদের ভূমি হারিয়ে ফেলে এবং শরণার্থী হয়ে যান। তারা একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে থাকে, তেমনি আরেকদিকে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে। প্যালেস্টিনীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, যার মধ্যে ফাতাহ এবং অন্যান্য সংগঠন ছিল, পরবর্তীতে এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

ক.প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ

ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস একটি দীর্ঘ এবং বহুমুখী বিষয়, যা বিভিন্ন সময়কাল, সংগঠন, এবং কৌশল নিয়ে গঠিত। ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ফিলিস্তিনির রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রধান লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক মহলে তাদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন আদায় করা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন যেমন: হামাস (যারা গাজার শাসক), ফাতাহ, আল-আকসা ব্রিগেড এবং অন্যান্য গেরিলা সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠন রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয়ভাবে বিভিন্নভাবে কাজ করছে।

- **প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO):** ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি ফিলিস্তিনিদের জাতীয় অধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে কাজ করেছিল।

- **ফাতাহ:** পিএলও-এর মূল শাখা ছিল এটি, যার নেতৃত্বে ইয়াসির আরাফাত ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন।

- **হামাস: ১৯৮৭** সালে গঠিত, হামাস ফিলিস্তিনে একটি ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে পরিচিত, যা ইসরায়েলি দখলদারি বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে আসছে।

- **১৯৬৭** সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়, যা ফিলিস্তিনিরা তাদের স্বাধীনতার দাবির কেন্দ্রে রেখেছে।

➤ **শান্তি চুক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী সংকট:**

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পরপরই, ইসরায়েল এবং আরব দেশগুলির মধ্যে শান্তি চুক্তির আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হলেও, এই শান্তি প্রক্রিয়া সবসময়ই অস্থির ছিল। **১৯৬৭** সালের যুদ্ধ (ছয় দিনের যুদ্ধ) ইসরায়েল আরও কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়, এবং ফিলিস্তিনীদের জন্য শরণার্থী সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খ. প্রথম ইন্তিফাদা এবং হামাসের উত্থান

১৯৮০ সালের পর থেকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলো মূলত হামাস, ফাতাহ, এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। এগুলো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে স্বাধীনতা ও অধিকারের দাবিতে এবং ইসরায়েলের দখলদারি, অবরোধ, এবং সামরিক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে সংঘটিত হয়।

১. প্রথম ইন্তিফাদা

১৯৮৭ সালের প্রথম ইন্তিফাদা (First Intifada) ছিল ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে একটি বড় বেসামরিক প্রতিবাদ আন্দোলন, যা পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলের দখলদারি থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

➤ ইন্তিফাদার সূচনা

- ১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর, গাজা উপত্যকায় একটি ইসরায়েলি সেনা ট্রাক একটি ফিলিস্তিনি পরিবারকে আঘাত করে, যার ফলে চারজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। এই ঘটনা ফিলিস্তিনে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গাজা এবং পশ্চিম তীরে প্রতিবাদ শুরু হয় এবং তা দ্রুত বড় আকার ধারণ করে।

- ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভ, অসহযোগিতা, হরতাল, পাথর ছোঁড়া, এবং ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য বেসামরিক প্রতিবাদমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে।

➤ আন্দোলনের লক্ষ্য

প্রথম ইন্তিফাদার মূল লক্ষ্য ছিল:

- ইসরায়েলি দখলদারি থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তি,
- ফিলিস্তিনিদের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা,

- এবং স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জন।

➤ **ইন্তিফাদার বিশেষত্ব**

প্রথম ইন্তিফাদার সময়ে ফিলিস্তিনিরা মূলত পাথর ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিল, এবং তারা গেরিলা যুদ্ধের পরিবর্তে বেসামরিক অসহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ইসরায়েলি সেনারা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যেমন সংঘর্ষ দমন করতে কারফিউ জারি, বিক্ষোভকারীদের ওপর শক্তি প্রয়োগ, এবং গণগ্রেফতার।

➤ **ইন্তিফাদার পরিণতি**

প্রথম ইন্তিফাদার প্রায় ৬ বছর স্থায়ী হয় । এবং ১৯৯৩ সালে **ওসলো চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়।** এই চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব পিএলও (PLO) গ্রহণ করে এবং কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের আত্মশাসন দেয়া হয়। তবে, ইন্তিফাদা শেষ হলেও, ইসরায়েলি দখলদারি এবং ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম চলতে থাকে।

প্রথম ইন্তিফাদার পর, ফিলিস্তিনের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রতি একটি নতুন মনোভাব তৈরি হয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের জন্য সমর্থন বাড়ে।

পিএলও ওসলো চুক্তি

ওসলো চুক্তি (Oslo Accords) **১৯৯৩** সালে স্বাক্ষরিত একটি ঐতিহাসিক চুক্তি, যা ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এই চুক্তি দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের একটি নতুন দিক উন্মোচন করে এবং ইসরায়েলি-প্যালেস্টিনিয়ান সংঘাতের সমাধানের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করেছিল।

➤ ওসলো চুক্তির সূচনা

ওসলো চুক্তি আসলে একটি সিরিজের আলোচনার ফলাফল ছিল, যা **১৯৯২-১৯৯৩ সালে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়**। এই আলোচনাগুলি নরওয়ে সরকারের মধ্যস্থতায় হয়, যেখানে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিরা একটি গোপন পরিবেশে আলোচনা করেন। এই চুক্তির ভিত্তি ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা।

➤ চুক্তির মূল শর্তাবলী

ওসলো চুক্তি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত:

১. প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO)-এর স্বীকৃতি: চুক্তির মাধ্যমে, ইসরায়েল **প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO)** কে একটি বৈধ রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যা ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করবে।

২. আত্মশাসন: চুক্তির মধ্যে ফিলিস্তিনিদের জন্য পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় **আত্মশাসন** প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে, ফিলিস্তিনিদের নিজেদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ইসরায়েলি নিরাপত্তা এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও ইসরায়েলের অধীনে থাকবে।

3. ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার: ইসরায়েলি সেনারা পশ্চিম তীর ও গাজার কিছু অংশ থেকে প্রত্যাহার করবে এবং সেখানে ফিলিস্তিনী পুলিশ বাহিনী অবস্থান করবে।

4. ভবিষ্যৎ আলোচনা: চুক্তি অনুযায়ী, উভয় পক্ষ একে অপরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভবিষ্যতে তাদের ভূখণ্ড ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছাবে।

➤ চুক্তির স্বাক্ষর

সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে, **ওসলো চুক্তি** স্বাক্ষরিত হয় **ওয়াশিংটন ডিসি**-তে। চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:

- ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইতজাক রবিন,
- প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (PLO) নেতা ইয়াসির আরাফাত,
- আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

স্বাক্ষরের সময়, রবিন এবং আরাফাত একে অপরকে **নোবেল শান্তি পুরস্কার** প্রদান করার জন্য নির্বাচিত হন (১৯৯৪ সালে)। এই চুক্তির ফলস্বরূপ, ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন একে অপরকে স্বীকৃতি দেয় এবং শান্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

➤ চুক্তির ফলস্বরূপ

আত্মশাসন: পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যা তাদের নিজেদের প্রশাসন গঠন করতে সহায়ক হয়।

শান্তির জন্য অঙ্গীকার: দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ভবিষ্যতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম শুরু করে।

➤ চুক্তির চ্যালেঞ্জ

তবে, ওসলো চুক্তি সত্ত্বেও, পুরোপুরি শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এর কিছু প্রধান কারণ:

- **ইসরায়েলি বসতি স্থাপন:** ইসরায়েলি বসতি স্থাপন পশ্চিম তীরে অব্যাহত ছিল, যা ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছিল।

- **শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা:** ভবিষ্যতের চুক্তিগুলি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে ভূমির ভাগাভাগি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি সীমিত ছিল।

- **হামাসের আপত্তি:** ইসলামী প্রতিরোধ সংগঠন হামাস ও অন্যান্য কিছু ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী চুক্তির বিরোধিতা করে, যা শান্তির পথে আরও বাধা সৃষ্টি করে।

ওসলো চুক্তি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তির সম্ভাবনা তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল, তবে এটি পরবর্তীতে শান্তির সমাধান প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি।

২. হামাসের আন্দোলন

মিশরের ইসলামি রাজনৈতিক দল **মুসলিম ব্রাদারহুড** একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনায়। ফিলিস্তিনের বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের মধ্যে অনেকেই মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানকার মুসলিম ব্রাদারহুডের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম দুটি প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন **আহমেদ ইয়াসিন** এবং **আব্দেল আজিজ আল-রানতিসি**, যাদের নেতৃত্বে ১৯৮৭ সালে হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

➤ হামাসের প্রতিষ্ঠা

হামাস হচ্ছে, হারকাত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া- এর সংক্ষেপ, যার অর্থ **ইসলামি নবজাগরণ আন্দোলন।** হামাসের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর, **প্রথম ইন্তিফাদার** (First Intifada) সময়ে। হামাসের জন্ম ইয়াযুদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেড নামে একটি ইসলামিক গেরিলা সংগঠনের ভিত্তির ওপর। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতারা ফিলিস্তিনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ইসলামিক আন্দোলনকে সামনে নিয়ে আসেন। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন ছিলেন এর প্রথম নেতা, যিনি গাজা অঞ্চলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতেন।

হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ ইয়াসিন এবং আব্দেল আজিজ আল-রানতিসি ইসলামিক প্রতিরোধের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য কাজ শুরু করেন।

➤ হামাসের সংগঠন

হামাসের দুটি প্রধান শাখা রয়েছে:

১. দাওয়াহ: হামাস শুধুমাত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন নয়, বরং একটি সমাজসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানও। এটি সাংস্কৃতিক শাখা, যা ইসলামি শিক্ষা এবং সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার করে। তারা গাজা এবং পশ্চিম তীরে মসজিদ, স্কুল, হাসপাতাল এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে তাদের জনগণের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. ইয়াযুদ্দীন আল-কাসসাম ব্রিগেডস: এটি হামাসের সামরিক শাখা, যা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেয়।

➤ হামাসের আদর্শ ও লক্ষ্য

হামাসের আদর্শ ইসলামিক মৌলবাদ এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা। এর মূল লক্ষ্য:
১. ইসরায়েলকে বিতাড়িত করা: হামাসের বিশ্বাস অনুযায়ী, ইসরায়েল একটি অবৈধ রাষ্ট্র, এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা ও ফিলিস্তিনে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা: ফিলিস্তিনে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হামাসের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তারা ইসলামিক শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৩. জাতীয় প্রতিরোধ: ইসরায়েলি দখলদারি ও ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষার জন্য হামাস সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়।

➤ হামাসের রাজনীতি

হামাস **২০০৬** সালে অনুষ্ঠিত **প্যালেস্টিনিয়ান পার্লামেন্টারি নির্বাচন**-এ বড় বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচনে হামাস ফিলিস্তিনের **প্যালেস্টাইন অথরিটির** (PA) রাজনৈতিক দল **ফাতাহ**-কে পরাজিত করে এবং গাজার শাসক শক্তি হিসেবে উঠে আসে। এর ফলে গাজা উপত্যকায় হামাসের পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ফাতাহ পশ্চিম তীরে ক্ষমতায় থাকে।

➤ হামাসের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- **ইসরায়েলি প্রতিরোধ:** হামাস ইসরায়েলকে ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যায়। এর ফলে গাজা এবং ইসরায়েলি সীমান্তে সহিংসতার ঘটনাবলি বারবার ঘটে।

- **আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সমালোচনা:** হামাসকে কিছু আরব দেশ, যেমন ইরান ও সুদান সমর্থন দেয়, তবে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

➤ হামাসের সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জ

- **গাজা শাসন:** গাজায় হামাসের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর, তারা অঞ্চলটির জন্য ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। তবে, গাজার জনগণের ওপর ইসরায়েলের অবরোধ এবং অর্থনৈতিক চাপ, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধা প্রাপ্তি কঠিন করে তোলে।

- **সামরিক সংঘর্ষ:** হামাস ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ ঘটেছে। এর মধ্যে ২০০৮, ২০১২ এবং ২০১৪ সালের গাজা যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য, যেখানে হামাস ও ইসরায়েল মুখোমুখি হয়েছিল।

- **রাজনৈতিক সংকট:** হামাস এবং ফাতাহর মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন, ফিলিস্তিনিদের একত্রিত করার একটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, হামাসের শাসন ব্যবস্থা কখনও কখনও সমালোচনার মুখে পড়েছে, বিশেষত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

➤ হামাসের সংগ্রাম

হামাসের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৮৭ সালে এবং এটি এখনও চলমান রয়েছে। তাদের লক্ষ্য হল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং মুসলিম বিশ্বের ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। হামাস মূলত গাজা উপত্যকায় শক্তিশালী হলেও, পশ্চিম তীরে এবং অন্যান্য অঞ্চলেও এর সমর্থক রয়েছে।

তারা তাদের সংগ্রামকে মুক্তিকামী যোদ্ধা হিসেবে গণ্য করে এবং ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। হামাস বিশ্বাস করে যে, তাদের মুজাহিদ বাহিনী একদিন বায়তুল মাকদিস (আল-আকসা মসজিদ) পুনরায় মুসলিমদের হস্তগত করবে, ইনশাআল্লাহ। এইভাবে, হামাস ইসরায়েলি দখলদারি ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে, একে অপরকে সমর্থন দিয়ে এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ.দ্বিতীয় ইন্তিফাদা এবং গাজার বিভাজন

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা (আল-আকসা ইন্তিফাদা) এবং গাজার বিভাজন ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ২০০০ সালে শুরু হওয়া ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বৃহৎ প্রতিরোধ আন্দোলন এবং হামাস-ফাতাহ সংঘাতের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের পথ তৈরি করে।

১. দ্বিতীয় ইন্তিফাদা/ আল-আকসা ইন্তিফাদা

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা (Second Intifada), যা **আল-আকসা ইন্তিফাদা** নামেও পরিচিত, **২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর** শুরু হয় এবং প্রায় ৫ বছর ধরে চলে (২০০৫ সালে শেষ হয়)। এই ইন্তিফাদাটি প্রথম ইন্তিফাদার তুলনায় আরও সহিংস ছিল এবং এর ফলে ইসরায়েলি সেনা ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ এবং সহিংসতা ঘটে।

➤ দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সূচনা

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সূত্রপাত ঘটে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন ইসরায়েলের পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী **অরিয়েল শ্যারন** (Ariel Sharon) **আল-আকসা মসজিদ পরিদর্শনে** যান। ফিলিস্তিনিরা এটি একটি provocation (উদ্দীপক) হিসেবে গ্রহণ করে, কারণ আল-আকসা মসজিদ মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র স্থান এবং এটি পূর্ব জেরুসালেমে অবস্থিত, যা ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ একটি এলাকা।শ্যারণের ওই পদক্ষেপের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিরা জেরুসালেমে বিক্ষোভ শুরু করে, যা দ্রুত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিণতিতে সহিংসতা শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় পরিণত হয়।

➤ দ্বিতীয় ইন্তিফাদার মূল ঘটনাবলী

১. সহিংসতা ও বিদ্রোহ: দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময়ে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে পাথর ছোঁড়া, ককটেল হামলা, এবং আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়। ইসরায়েলি সেনারা কঠোর প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেয়, যার মধ্যে গুলি চালানো, ট্যাঙ্ক ব্যবহার এবং বিমান হামলা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. আত্মঘাতী বোমা হামলা: দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময়ে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গ্রুপগুলো, বিশেষ করে **হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ,** আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাতে থাকে। এই হামলাগুলো ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে ছিল এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই ধরনের হামলা ইসরায়েলে "বোমা সন্ত্রাস" হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

৩. ইসরায়েলি সেনাদের প্রতিরোধ: ইসরায়েলি সেনারা, বিশেষ করে তাদের বিশেষ বাহিনী, ফিলিস্তিনিদের দমন করতে ব্যাপকভাবে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। তারা গাজা এবং পশ্চিম তীরে অভিযান চালায় এবং অনেক ফিলিস্তিনি নেতাকে গ্রেফতার বা হত্যা করে। গাজা ও পশ্চিম তীরের বহু অঞ্চল কঠোরভাবে অবরুদ্ধ ছিল, এবং এই অবরোধের ফলে ফিলিস্তিনিদের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. জেনিন শরণার্থী শিবিরের অভিযান: ২০০২ সালে, ইসরায়েলি সেনারা পশ্চিম তীরের **জেনিন শরণার্থী শিবিরে** একটি বড় **অভিযান** পরিচালনা করে, যেখানে তারা শিবিরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং ব্যাপকভাবে হামলা চালায়। এতে বহু ফিলিস্তিনি নিহত হয়, এবং শিবিরটি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

৫. মৌলিক শান্তি আলোচনা ব্যর্থতা: দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময়ে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনিরা একাধিক শান্তি আলোচনা শুরু করেছিল, তবে এই আলোচনা গুলি সফল হয়নি। বিশেষত ২০০০ সালের কাম্প ডেভিড শীর্ষ সম্মেলন এবং ২০০১ সালের টাবা চুক্তি ব্যর্থ হয়, যা শান্তির জন্য একটি বড় সুযোগ ছিল।

➤ **ফলাফল ও পরিণতি:**

- **মানবিক ক্ষতি:** দ্বিতীয় ইন্তিফাদার ফলে **প্রায় ৪,০০০ ফিলিস্তিনি** নিহত হয়।

- **ইসরায়েলের নিরাপত্তা কৌশল পরিবর্তন:** দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ইসরায়েলকে তার নিরাপত্তা কৌশল পুনরায় পর্যালোচনা করতে বাধ্য করে। এর পর, ইসরায়েল তার সীমান্তে নিরাপত্তা প্রাচীর তৈরি করে, যা পশ্চিম তীরের কিছু অংশকে বিচ্ছিন্ন করে এবং এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের চলাচল কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়।

- **হামাসের উত্থান:** দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময়ে হামাস (Hamas) আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হামাসের নেতৃত্বে গাজা উপত্যকায় ইসলামিক প্রতিরোধের একটি নতুন রূপ দেখতে পাওয়া যায়, এবং এটি পরবর্তীতে গাজা অঞ্চলের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে (২০০৭ সাল থেকে)।

- **ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বিভাজন:** দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পর, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন বেড়ে যায়, বিশেষ করে **ফাতাহ ও হামাস** এর মধ্যে। **ফাতাহ পশ্চিম তীরে** অধিকৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে, এবং **হামাস গাজা উপত্যকায়** ক্ষমতা দখল করে।

২. হামাস এবং ফাতাহর মধ্যে বিভাজন

হামাস ও ফাতাহ মূলত ফিলিস্তিনের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল, হামাস ও ফাতাহ-এর মধ্যে সংঘর্ষ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে শুরু হয়। ২০০৬ সালের ফিলিস্তিনি নির্বাচনের পর এই দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ ধারণ করে এবং ২০০৭ সালে গাজা উপত্যকায় পূর্ণাঙ্গ সংঘর্ষে রূপ নেয়।

➤ সংঘর্ষের সূচনা (২০০৬-২০০৭)

২০০৬ সালের ফিলিস্তিনি পার্লামেন্টারি নির্বাচনে হামাস নির্বাচনে বড় বিজয় অর্জন করে এবং ফিলিস্তিনের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অপরদিকে, ফাতাহ যা দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিল, নির্বাচন হেরে যায়। হামাস সরকার গঠন করে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে এটি স্বীকৃতি পায়নি কারণ তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করে। নির্বাচনী বিজয়ের পর হামাস ফিলিস্তিনের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ফাতাহ ও হামাসের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। ফলে পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় হামাস ও ফাতাহ সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।

➤ গৃহযুদ্ধের সূচনা

২০০৭ সালে গাজা উপত্যকায় হামাস ও ফাতাহর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। হামাস ফাতাহ সমর্থিত প্যালেস্টাইনি নিরাপত্তা বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় এবং গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

গ্রহণ করে। সংঘর্ষে কয়েকশো লোক নিহত হয় এবং গাজা ও পশ্চিম তীর কার্যত দুটি আলাদা শাসনে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

➤ সংঘর্ষের ফলাফল

জুন ২০০৭-এ হামাস গাজা উপত্যকায় ফাতাহর সকল প্রতিরোধ দমন করে এবং পুরোপুরি গাজার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ফাতাহ পশ্চিম তীরে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, যেখানে মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন প্যালেস্টাইন অথরিটি (PA) শাসন চালিয়ে যায়।

১. রাজনৈতিক বিভাজন:

ফিলিস্তিন দুটি আলাদা প্রশাসনে বিভক্ত হয়ে যায়:

- গাজা (হামাসের শাসন)।
- পশ্চিম তীর (ফাতাহর শাসন)।
- এই বিভাজন ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে এখনও অব্যাহত আছে এবং এটি ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সংকটের একটি বড় কারণ।

২. আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:

- যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফাতাহকে সমর্থন দেয়।
- হামাসের শাসনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে।

৩. গাজার মানবিক সংকট:

- হামাসের শাসন শুরু হওয়ার পর ইসরায়েল **গাজায় অবরোধ** আরোপ করে।
- গাজার অর্থনীতি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

➤ সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও মিলনের প্রচেষ্টা

- **২০১১** সাল থেকে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে একাধিক শান্তি চুক্তি হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন সফল হয়নি।
- ২০১৭ সালে গাজার প্রশাসন ফাতাহর কাছে হস্তান্তর করার ঘোষণা দেয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি।

➤ **ফিলিস্তিনিদের জন্য প্রভাব**

- হামাস ও ফাতাহর বিভাজন ফিলিস্তিনি জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করেছে।
- **ইসরায়েল এই বিভাজনকে ব্যবহার** করে **ফিলিস্তিনি অধিকারের দাবি উপেক্ষা** করার সুযোগ পেয়েছে।

৩. গাজা যুদ্ধ (অপারেশন কাস্ট লিড)

গাজা যুদ্ধ বা অপারেশন কাস্ট লিড ছিল ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮ জানুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত মোট ২২ দিন ধরে চলা ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘটিত একটি বড় সামরিক সংঘর্ষ। এই যুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের চালানো একটি ব্যাপক অভিযান ছিল। এটি ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হামলাগুলোর একটি বলে বিবেচিত।

➤ **যুদ্ধের পটভূমি**

- **গাজায় হামাসের ক্ষমতা দখল:** ২০০৭ সালে হামাস গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর থেকে ইসরায়েল গাজায় অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ আরোপ করে।

- **রকেট হামলা:** হামাস এবং অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী দক্ষিণ ইসরায়েলে রকেট ও মর্টার হামলা চালাতে থাকে। ইসরায়েল এই হামলাকে তার নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখে।

- **ছয় মাসের যুদ্ধবিরতি ব্যর্থ:** ২০০৮ সালের জুনে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। কিন্তু ডিসেম্বর ২০০৮-এ এই চুক্তি ভেঙে যায়, এবং সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হয়।

➤ **সংঘর্ষের ধাপ**

বিমান হামলা: ২০০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর ইসরায়েল গাজা উপত্যকার উপর ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। হামাসের সামরিক ও প্রশাসনিক স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে হামলা করা হয়। এই হামলায় শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়।

স্থল অভিযান: ২০০৯ সালের ৩ জানুয়ারি ইসরায়েল গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী গাজা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে হামাসের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়।

যুদ্ধবিরতি: ২০০৯ সালের ১৭ জানুয়ারি ইসরায়েল একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। পরদিন হামাসও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সংঘর্ষ শেষ হয়।

➤ **প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিঃ**

- প্রায় ১,৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক মানুষ। আহত হয় প্রায় ৫,০০০ ফিলিস্তিনি। গাজার অবকাঠামো ব্যাপক ধ্বংস হয়; স্কুল, হাসপাতাল এবং বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যায়।

- ইসরায়েলি ক্ষয়ক্ষতি: ১৩ জন নিহত, যার মধ্যে ১০ জন ছিল সেনা। প্রায় ১০০ জন আহত হয়।

➤ **আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**

- **সমালোচনা:** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরায়েলের উপর বেসামরিক মানুষ হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে। **জাতিসংঘ** এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ইসরায়েলের কার্যক্রমকে **অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ** বলে অভিহিত করে।

- **সমর্থন:** যুক্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি পশ্চিমা দেশ ইসরায়েলের "আত্মরক্ষার অধিকার" সমর্থন করে।

- গোল্ডস্টোন রিপোর্ট (২০০৯): জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এই যুদ্ধ নিয়ে একটি তদন্ত চালায়। রিপোর্টে উভয় পক্ষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়।

➤ **ফলাফল**

- **গাজার মানবিক সংকট:** গাজায় খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ এবং চিকিৎসা পরিষেবার সংকট আরও বেড়ে যায়। ইসরায়েলের অবরোধ আরো কঠোর হয়।

- **হামাসের অবস্থান:** হামাস সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বজায় থাকে। তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে।

- **ইসরায়েলের নিরাপত্তা:** ইসরায়েলের লক্ষ্য ছিল হামাসের সামরিক ক্ষমতা দুর্বল করা, তবে তারা সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারেনি।

অপারেশন কাস্ট লিড ছিল ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের ইতিহাসে অন্যতম ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ। এটি ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি অবরোধ এবং হামাসের প্রতিরোধকে আরও তীব্র করে তোলে। যুদ্ধটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েল ও হামাসের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক বাড়ায় এবং ফিলিস্তিনিদের সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঘ. সাম্প্রতিক প্রতিরোধ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ (২০১১-বর্তমান)

২০১১ সাল থেকে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন রূপ দেখা গেছে। গাজার উপর ইসরায়েলি অবরোধ, সামরিক হামলা, এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফিলিস্তিনিদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সময়ের লড়াই আরও বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

১. দ্বিতীয় গাজা যুদ্ধ (অপারেশন পিলার অফ ডিফেন্স)

দ্বিতীয় গাজা যুদ্ধ, যা ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের কোড নাম অপারেশন পিলার অফ ডিফেন্স, ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শুরু হয় ১৪ নভেম্বর ২০১২ এবং শেষ হয় ২১ নভেম্বর ২০১২। এটি ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এবং গাজাভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আট দিনের একটি সংঘর্ষ ছিল।

➤ **যুদ্ধের প্রেক্ষাপট**

- **ইসরায়েল-গাজার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা:** ইসরায়েলি অবরোধ ও দমননীতি, এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীর রকেট হামলা সংঘাতের মূল কারণ। গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম এবং ইসরায়েলের পাল্টা দমন অভিযান দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল।

- **হামাস নেতার হত্যা:** ইসরায়েলি বাহিনী হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসসাম ব্রিগেডের নেতা আহমেদ জাবারিকে টার্গেট করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডই যুদ্ধের সরাসরি কারণ হয়ে ওঠে।

➤ **ইসরায়েলের সামরিক অভিযান**

- ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজায় হামাসের সামরিক স্থাপনা, রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়।
- গাজা শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক বোমাবর্ষণ হয়।

➤ **হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিরোধ:**

- হামাস এবং ইসলামিক জিহাদসহ গাজাভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইসরায়েলের দিকে শত শত রকেট নিক্ষেপ করে।
- ইসরায়েলের প্রধান শহরগুলোতে রকেট হামলা সংঘটিত হয়, যা আগে বিরল ছিল।
- হামাস নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফজর-৫ রকেট দিয়ে তেল আবিব এবং জেরুজালেম লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

➤ **প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি**

- **ফিলিস্তিনে:** প্রায় ১৭৪ ফিলিস্তিনি নিহত, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক। শত শত মানুষ আহত হয় এবং গাজার অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- **ইসরায়েলে:** প্রায় ৬ জন ইসরায়েলি নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়।,রকেট হামলায় কিছু সম্পত্তি ধ্বংস হয়।

➤ **যুদ্ধবিরতি ও মিশরের ভূমিকা**

মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়।

যুদ্ধবিরতির শর্ত ছিল: ইসরায়েল গাজার ওপর হামলা বন্ধ করবে। গাজা থেকে ইসরায়েলের দিকে রকেট হামলা বন্ধ করা হবে।

➤ **যুদ্ধের ফলাফল**

- **ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রভাব:** গাজার জনগণের জন্য মানবিক সংকট আরও তীব্র হয়। হামাসের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়, কারণ তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছিল।

- **ইসরায়েলের পক্ষে প্রভাব:** ইসরায়েল নিজেদের নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রদর্শন করে। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আরও জোরদার হয়।

➤ **আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**

- **জাতিসংঘ:** জাতিসংঘ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানায় এবং উভয় পক্ষকে সহিংসতা বন্ধ করতে আহ্বান জানায়।

- **যুক্তরাষ্ট্র: যু**ক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করে এবং তাদের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানায়।

- **আরব দেশসমূহ:** আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানালেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

২০১২ সালের দ্বিতীয় গাজা যুদ্ধ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং ইসরায়েলি দমননীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও এই সংঘর্ষ ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করেছিল, তবে গাজার অবরোধ এবং ফিলিস্তিনি জনগণের মানবাধিকার সংকট নিরসনে কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে ব্যর্থ হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রাম এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান এখনও সুদূরপরাহত।

২. গাজার তৃতীয় যুদ্ধ (অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ)

২০১৪ সালের গাজার তৃতীয় যুদ্ধ, যুদ্ধ শুরু হয় ৮ জুলাই ২০১৪ এবং শেষ হয় ২৬ আগস্ট ২০১৪।

এটি ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কোড নাম অপারেশন প্রোটেকটিভ এজ (Operation Protective Edge) নামে পরিচিত, ইসরায়েল এবং গাজা নিয়ন্ত্রিত হামাসের মধ্যে ৫০ দিনব্যাপী একটি ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ ছিল। এটি গাজা উপত্যকার জনগণের ওপর আরও বড় আকারে মানবিক সংকট সৃষ্টি করে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

➤ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- হামাস ও ফাতাহের সমঝোতা: ২০১৪ সালের এপ্রিলে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে ঐক্যের সরকার গঠনের ঘোষণায় ইসরায়েলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ইসরায়েল ঐক্যের সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং হামাসকে লক্ষ্যবস্তু করার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

- ইসরায়েলি কিশোরদের অপহরণ ও হত্যা: জুন ২০১৪-তে তিন ইসরায়েলি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে ইসরায়েল গাজা ও পশ্চিম তীরে ব্যাপক অভিযান চালায়। ইসরায়েলের এই অভিযানে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি নিহত এবং শত শত গ্রেফতার হয়।

- উত্তেজনা বৃদ্ধি: ইসরায়েলি অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় হামাস গাজা থেকে ইসরায়েলের দিকে রকেট নিক্ষেপ শুরু করে। ইসরায়েল গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে সংঘাত শুরু করে।

➤ যুদ্ধের প্রধান ঘটনা

- ইসরায়েলের সামরিক অভিযান: ইসরায়েল গাজার ওপর ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। ১৭ জুলাই স্থল অভিযান শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল হামাসের তৈরি সুরঙ্গপথ ধ্বংস করা। গাজা শহরের বড় অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

- হামাসের প্রতিরোধ: হামাস এবং অন্যান্য গোষ্ঠী ইসরায়েলের দিকে কয়েক হাজার রকেট ছোড়ে। তাদের উন্নত রকেট প্রযুক্তি তেল আবিব এবং অন্যান্য শহরেও আঘাত হানে। ইসরায়েলের অভ্যন্তরে সুরঙ্গপথ ব্যবহার করে হামলা চালানো হয়।

- আয়রন ডোমের ভূমিকা: ইসরায়েলের আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বহু রকেট ভূপাতিত করে, যার ফলে ইসরায়েলে ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়।

➤ **প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি**

- **ফিলিস্তিনে:** প্রায় ২,২৫১ ফিলিস্তিনি নিহত, যাদের মধ্যে ১,৪৬২ জন বেসামরিক এবং ৫০০-এর বেশি শিশু। প্রায় ১১,০০০ জন আহত এবং লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। গাজার অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়, যার মধ্যে বাড়ি, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা।

- ইসরায়েলে: প্রায় ৭৩ জন নিহত, যাদের মধ্যে ৬৭ জন সৈন্য এবং ৬ জন বেসামরিক। রকেট হামলায় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

➤ **যুদ্ধবিরতি ও মিশরের মধ্যস্থতা**

- **চুক্তি:** মিশরের মধ্যস্থতায় ২৬ আগস্ট ২০১৪-তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।
- **শর্ত:** উভয় পক্ষ হামলা বন্ধ করবে। গাজার ওপর থেকে কিছু অবরোধ শিথিল করা হবে এবং পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা আসবে।

➤ **যুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল**

- **মানবিক সংকট:** গাজার অবরোধ আরও কঠোর হয়। বিদ্যুৎ, খাদ্য, পানি, এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতি তীব্রতর হয়।

- **হামাসের শক্তি প্রদর্শন:** হামাস রকেট হামলা এবং সুরঙ্গ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিরোধের নতুন কৌশল প্রদর্শন করে।

- **আন্তর্জাতিক সমালোচনা:** ইসরায়েলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা প্রতিবাদ জানায়। হামাসের রকেট হামলাও সমালোচিত হয়।

➤ **রাজনৈতিক বিভাজন**

ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে হামাস ও ফাতাহর বিভাজন আরও গভীর হয়। গাজার পুনর্গঠন এবং আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে ফাতাহর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

➤ **আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**

- **জাতিসংঘ:** জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করার জন্য চাপ দেয়। মানবাধিকার কাউন্সিল ইসরায়েলি হামলার তদন্ত শুরু করে।

- **যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন:** যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নও ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানায়, তবে মানবিক সহায়তার তাগিদ দেয়।

- **আরব দেশসমূহ:** আরব দেশগুলো সমালোচনা করলেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

২০১৪ সালের গাজার তৃতীয় যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগণের মানবিক সংকটকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে এই সংঘর্ষ ফিলিস্তিনের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সহিংসতা সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও, গাজার অবরোধ এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এ যুদ্ধ ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকটের স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট করে।

৩.গ্রেট মার্চ অফ রিটার্ন ও সীমান্ত সংঘর্ষ

গ্রেট মার্চ অফ রিটার্ন (Great March of Return) হলো গাজায় অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ বিক্ষোভ আন্দোলন, যা ২০১৮ সালের ৩০ মার্চ শুরু হয় এবং ২০১৯ সালের শেষ পর্যন্ত চলে। এটি ছিল ফিলিস্তিনিদের একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, যেখানে তারা তাদের ফিরে আসার অধিকার এবং গাজার উপর ইসরায়েলি অবরোধের অবসানের দাবি জানান। কিন্তু এই আন্দোলনটি তীব্র সহিংসতার দিকে মোড় নেয়, যা সীমান্তে সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

➤ **পটভূমি**

- **ফিলিস্তিনি শরণার্থী সমস্যা:** ১৯৪৮ সালের নাকবা (ফিলিস্তিনি "ক্যাটাস্ট্রফি") থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনি শরণার্থীরা তাদের ভিটেমাটি হারিয়েছে। তাদের অধিকাংশই এখন প্রতিবেশী দেশগুলোতে, বিশেষত গাজা, লেবানন ও জর্ডানে, শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাস করছেন এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার দাবি করেন।

- **গাজার অবরোধ:** ২০০৭ সালে হামাস গাজায় ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ইসরায়েল ও মিশর গাজা উপত্যকায় একটি অবরোধ আরোপ করে। গাজার জনগণের জন্য মানবিক সংকট এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

- **আন্তর্জাতিক সমর্থন ও প্রতিবাদ:** ফিলিস্তিনিদের ফিরে আসার অধিকারের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা ও মানবাধিকার গোষ্ঠী সমর্থন জানিয়েছিল, তবে রাজনৈতিক সমাধান বাস্তবায়িত হতে ব্যর্থ হয়।

➤ **গ্রেট মার্চ অফ রিটার্ন: আন্দোলনের শুরু**

- ২০১৮ সালের ৩০ মার্চ "ভূমি দিবস" উপলক্ষে গাজা সীমান্তের কাছে শুরু হয় গ্রেট মার্চ অফ রিটার্ন। আন্দোলনটি মূলত ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের তাদের ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার এবং গাজার অবরোধের অবসান দাবি করে।

- **মূল দাবীসমূহ:** গাজার অবরোধ অবসান। ১৯৪৮ সালের নাকবা থেকে ভূমি হারানো ফিলিস্তিনিদের তাদের পূর্বপুরুষের জমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা। ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের বিচার ও আন্তর্জাতিক সমর্থন।

➤ **সীমান্তে সংঘর্ষ**

- **সহিংসতা:** প্রথম থেকেই, এই আন্দোলনটি সংঘর্ষে পরিণত হয়। গাজা সীমান্তে বিক্ষোভকারীরা ইসরায়েলি বাহিনীর দিকে পাথর ও অন্যান্য উপকরণ ছুড়তে থাকে। ইসরায়েলি সেনারা পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে এবং রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়তে থাকে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে হামাসের সমর্থকরা, ফাতাহ কর্মীরা, এবং অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীও ছিল, যারা সহিংস প্রতিবাদে অংশ নেয়।

- **বেসামরিক ক্ষতি:** গাজা সীমান্তে বিক্ষোভকারী কমপক্ষে ১৮০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়। এই সহিংসতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাদের প্রতিরক্ষা হিসেবে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে, তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলি গুলি চালানোকে অস্বাভাবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে।

➤ **আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া**

- **জাতিসংঘ:** জাতিসংঘ ইসরায়েলের গুলিবর্ষণের তীব্র সমালোচনা করে এবং বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এ নিয়ে তদন্ত শুরু করে, এবং ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তোলে।

- **যুক্তরাষ্ট্র:** যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে গুলি চালানোর সমর্থন জানায়। তবে কিছু ইউরোপীয় দেশ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

- **আরব দেশসমূহ:** বেশ কয়েকটি আরব দেশ ও সংগঠন ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানায়, এবং কিছু কিছু আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখে, তবে বাস্তবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

➤ **পরিণতি এবং যুদ্ধবিরতি**

- **মানবিক সংকট:** গ্রেট মার্চ অফ রিটার্ন আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গাজা উপত্যকায় অবরোধের ফলে জনজীবন আরও কঠিন হয়ে পড়ে। খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ এবং চিকিৎসা সেবা ব্যাপকভাবে অভাবগ্রস্ত।

- **যুদ্ধবিরতি চুক্তি:** ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একাধিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়, তবে স্থায়ী শান্তি এবং সমাধান অর্জনে তা সফল হয়নি। হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সহিংসতা অব্যাহত থাকে।

গ্রেট মার্চ অফ রিটার্ন আন্দোলন গাজার জনগণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, যা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। তবে, সীমান্তে সংঘর্ষের ফলে এ আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নিয়েছে, এবং গাজার মানবিক সংকট আরও তীব্র হয়েছে। এই আন্দোলন, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের সমাধানের জন্য আরও বৃহত্তর কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।

৪. চতুর্থ গাজা যুদ্ধ (অপারেশন গার্ডিয়ান অফ দ্য ওয়ালস)

অপারেশন গার্ডিয়ান অফ দ্য ওয়ালস (Operation Guardian of the Walls) ১০ মে ২০২১-এ যুদ্ধ শুরু হয় এবং ২১ মে ২০২১ পর্যন্ত চলে। এটি ইসরায়েল এবং গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে সংঘটিত এক বৃহৎ সামরিক সংঘর্ষ। এই যুদ্ধের উৎপত্তি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক উত্তেজনার মধ্যে, যা দ্রুত সহিংসতার রূপ নেয়। এই যুদ্ধটি গাজার মানুষ এবং ইসরায়েলি নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

➤ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

- জেরুজালেমে উত্তেজনা: শেখ জারাহ অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করার জন্য ইসরায়েলের পরিকল্পনা, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি পরিবারদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ, স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে প্রতিবাদের জন্ম দেয়।

২০২১ সালের মে মাসের প্রথম দিকে, ইসরায়েলি পুলিশ আল আকসা মসজিদে এবং জেরুজালেমের পুরোনো শহরে বিক্ষোভকারী মুসলিমদের উপর কঠোর ব্যবস্থা নেয়। এই ঘটনাগুলি উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় এবং হামাস এবং অন্যান্য গোষ্ঠীকে প্রতিবাদে অংশ নিতে প্ররোচিত করে।

- আল আকসা মসজিদে হামলা: আল আকসা মসজিদে ইসরায়েলি পুলিশ এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের পর, হামাস তাদের রকেট হামলা শুরু করে, যা গাজার দিকে রকেট নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইসরায়েল প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গাজার ওপর বিমান হামলা শুরু করে, এবং যুদ্ধ শুরু হয়।

➤ যুদ্ধের প্রধান ঘটনা

- **রকেট হামলা ও বিমান আক্রমণ:** হামাস গাজা থেকে রকেট নিক্ষেপ শুরু করে, যা ইসরায়েলের বিভিন্ন শহর, বিশেষত তেল আবিব ও আশদোদ পর্যন্ত পৌঁছায়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়ে হামাসের সামরিক

স্থাপনাগুলো, সুরঙ্গপথ, অস্ত্রাগার এবং অন্যান্য স্থাপনাগুলো ধ্বংস করে। ইসরায়েলের আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই সময়ে বেশ কিছু রকেট ভূপাতিত করে, তবে হামাসের অনেক রকেটই কার্যকরভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে।

- **আল-জাজিরা সাংবাদিক নিহত:** গাজার এক ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলা চালায়, যার ফলে আল-জাজিরা'র সাংবাদিক শিরিন আবু আকলেহ নিহত হন, যা আন্তর্জাতিক সমালোচনার সৃষ্টি করে। এই ঘটনাটি যুদ্ধের মানবিক দিককে আরও তীব্র করে তুলে।

- **ইসরায়েলি বসতিতে হামাসের আক্রমণ:** হামাস ইসরায়েলের বিভিন্ন শহর ও বসতির দিকে রকেট হামলা চালিয়ে, ইসরায়েলি নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বেশ কয়েকটি ইসরায়েলি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়।

➤ **মানবিক সংকট ও ক্ষয়ক্ষতি**

- **ফিলিস্তিনের ক্ষয়ক্ষতি:** ২৪০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়, যার মধ্যে বেশিরভাগই বেসামরিক, এবং শতাধিক শিশু নিহত হয়। ১,৯০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয় এবং গাজার অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়। গাজার হাসপাতাল, স্কুল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা মানবিক সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে।

- **ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি:** ১৩ জন ইসরায়েলি নিহত হয়, যাদের মধ্যে ১২ জন বেসামরিক এবং ১ জন সৈন্য। রকেট হামলার কারণে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহর, বিশেষত তেল আবিব, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক রকেটকে ভূপাতিত করে এবং বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করে।

➤ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

- **জাতিসংঘ ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি:** জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি গাজার উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলা এবং হামাসের রকেট হামলার তীব্র সমালোচনা করে এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে দাবি জানায়। জাতিসংঘ গাজার মানবিক সংকট মোকাবিলার জন্য দ্রুত সাহায্য প্রেরণের আহ্বান জানায়।

- **যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া:** যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন জানিয়ে, হামাসের রকেট হামলার প্রতি নিন্দা জানায়। ইউরোপীয় দেশগুলি ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকেও সমর্থন জানায়।

- **আরব দেশসমূহ:** আরব বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ ইসরায়েলের আক্রমণ এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিন্দা করে এবং তাদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।

➤ যুদ্ধবিরতি ও পরিণতি

- **যুদ্ধবিরতি:** ২১ মে ২০২১-এ মিশরের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল এবং হামাস একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছায়, যা কার্যকর হয় এবং সংঘর্ষ শেষ হয়।

- **পরিণতি:** এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ, গাজার মানবিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়ে, এবং এটি ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনে নতুন এক সংকটের সৃষ্টি করে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সম্পর্কের অবস্থা আবারও দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং শান্তি প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়ে।

২০২১ সালের অপারেশন গার্ডিয়ান অফ দ্য ওয়ালস ছিল ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাতের আরও একটি বিপর্যস্ত অধ্যায়, যা পুরো অঞ্চলে মানবিক ও রাজনৈতিক সংকটকে আরও গভীর করেছে। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তবে দীর্ঘমেয়াদী শান্তির জন্য কূটনৈতিক সমাধান এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক সংঘাত (২০২৩-২০২৪)

➤ গাজা-ইসরায়েল উত্তেজনা

ইসরায়েলি অবরোধ এবং ফিলিস্তিনিদের জমি দখল অব্যাহত থাকায় হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে সহিংসতা চলমান। ২০২৩-২০২৪ সালে, ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে সংঘাত এক নতুন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক মনোযোগ অর্জন করেছে।

১. হামাসের ইসরায়েল আক্রমণঃ তুফানুল আকসা (২০২৩)

তুফানুল আকসা (Al-Aqsa Flood) **২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর** হামাস ও অন্যান্য ইসলামি প্রতিরোধ গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত একটি বৃহৎ সামরিক অভিযান ছিল, যা গাজা থেকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে **রকেট হামলা** এবং স্থল আক্রমণের মাধ্যমে শুরু হয়। এটি ছিল সবচেয়ে বড় হামলা, যার ফলে **১৪০০ জনের বেশি ইসরায়েলি** নিহত হয় এবং ইসরায়েলি জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। হামাসের পক্ষ থেকে অবৈধ রাসায়নিক অস্ত্রসহ অস্ত্রের ব্যবহার এবং হাজার হাজার রকেট হামলা করা হয়, যা ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করে।

এ আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আল আকসা মসজিদ ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিশোধ নেওয়া এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের জন্য তাদের প্রতিবাদ জানানোর একটি প্রচেষ্টা।

➤ আক্রমণের শুরু

- ৭ অক্টোবর ২০২৩, হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ গাজা থেকে একযোগভাবে রকেট হামলা শুরু করে, এবং তারা ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চল এবং তেল আবিব লক্ষ্য করে হামলা চালায়।
- এই আক্রমণের মাধ্যমে হামাস এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি আল আকসা মসজিদে ইসরায়েলি বাহিনীর অনধিকার প্রবেশের প্রতিশোধ নেয় বলে দাবি করে।

➤ ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া এবং গাজায় অবরোধ

হামাসের আক্রমণের পর, ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে এবং সেখানকার বেসামরিক এলাকাগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এছাড়াও গাজায় তীব্র অবরোধ আরোপ করে, যার ফলে খাদ্য, পানি এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তার প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। গাজায় এই আক্রমণে হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত ও আহত হয়, এবং সেখানে একটি মারাত্মক মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়।

➤ বিশ্বের প্রতিক্রিয়া এবং শান্তির প্রচেষ্টা

এ সংঘাতের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া মিশ্রিত ছিল। কিছু দেশ হামাসের আক্রমণকে সমর্থন করলেও বেশিরভাগই ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন গাজার মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। তবে, সংঘাতের তীব্রতা ও ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কারণে এসব প্রচেষ্টা খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে ।

➤ লেবানন ও সিরিয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধি

এই সংঘাতের প্রভাব লেবানন এবং সিরিয়ায়ও পড়তে থাকে। লেবাননে হিজবুল্লাহ এবং হামাসের সমর্থনে কিছু হামলা চালানো হয়, যার ফলে ইসরায়েলি বাহিনী সেখানে বোমা হামলা শুরু করে। সিরিয়ায়ও কিছু হামাস সদস্যদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আক্রমণ চালানো হয়, যা আরও একবার যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

➤ গাজায় ত্রাণ কার্যক্রম এবং মানবিক সংকট

গাজার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে যখন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতব্য সংস্থাগুলি সাহায্য পাঠাতে শুরু করে। তবে ইসরায়েলি অবরোধ এবং সংঘাতের কারণে ত্রাণ সরবরাহ অনেক দেরিতে পৌঁছায় এবং মানুষের বেঁচে থাকার অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে ।

➤ হাসপাতাল ও নাগরিক অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

গাজার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয় এবং একাধিক হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, বেসামরিক অবকাঠামোগুলো যেমন স্কুল, মার্কেট এবং ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, যা দীর্ঘমেয়াদী পুনর্নির্মাণের বাধা সৃষ্টি করে ।

এই সংঘাতের কারণে গাজায় মানুষের জন্য এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক সাহায্য প্রদান নিয়ে আলোচনা চললেও পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত রয়েছে।

২. রাফাহ হামলা (২০২৩-২০২৪)

রাফাহ গাজা উপত্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর যা মিশরের সাথে সংযুক্ত। ২০২৩ সালের সংঘাতে, এই শহরের উপর ব্যাপক হামলা চালানো হয়, যা গাজার জনগণের জন্য নতুন এক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে।

➤ **আক্রমণের কারণ ও উদ্দেশ্য**

- ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া **হামাসের বড় আক্রমণের পর**, ইসরায়েল গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালাচ্ছিল, যাতে পুরো গাজার বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা বাড়ানো হয়।

- রাফাহ শহরের অবস্থান, যেখানে গাজা ও মিশরের সীমান্ত মিলিত। একটি কৌশলগত জায়গা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাফাহ আক্রমণের মূল কারণ ছিল **গাজার দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের অবস্থান এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তার হুমকি।**

- **রাফাহ অঞ্চলে হামাসের অস্ত্রাগার** এবং **সমর্থকদের অবস্থান ধ্বংস** করাই ছিল ইসরায়েলের উদ্দেশ্য।

➤ **পরিণতি**

- **২০২৩ সালে,** গাজার দক্ষিণ শহর রাফাহে ইসরায়েলের বিমান হামলা ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়, বিশেষত ডিসেম্বর মাসে। এসব হামলার মধ্যে একাধিক বেসামরিক এলাকা, হাসপাতাল এবং স্কুল লক্ষ্য করে আক্রমণ চালানো হয়, যেখানে শিশুসহ অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আহত হন।

- **১৯ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে এক বিমান হামলায় পশ্চিম রাফাহে একটি বাড়ি লক্ষ্য করে আঘাত হানে, যার ফলে ২২ জন নিহত হয়, এর মধ্যে **১১** জন শিশু ছিল। অনেকেই হামলার সময় ঘুমিয়ে ছিল এবং ঘরের ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে মারা যান।

- **২০২৪ সালে**, গাজায় ইসরায়েলি হামলাগুলি ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে।

- **২৬ মে, ২০২৪,** রাফার **টেল আল-সুলতান** এলাকায় একটি শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ বিমান হামলা চালানো হয়, যার ফলে কমপক্ষে **৪৫ থেকে ৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত** এবং ২০০-এরও বেশি আহত হন। এই হামলায়, ইসরায়েল **দুটি গাইডেড বোমা** ব্যবহার করে, যা **"কুয়েতি পিস"** নামক শিবিরটিতে আঘাত হানে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়।

- হামলার সময় শিবিরে আশ্রয় নেওয়া অসংখ্য বেসামরিক নাগরিক আগুনে পুড়ে মারা যান। ইসরায়েল দাবি করে যে তারা "হামাসের একটি ঘাঁটি" লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল, তবে স্যাটেলাইট ছবি ও ভিডিওগুলি দেখায় যে **হামলা সরাসরি শরণার্থী শিবিরে আঘাত হেনেছিল।**

- এছাড়া, হামলার আগে, ইসরায়েল শরণার্থীদের জন্য রাফা শহরের কিছু এলাকাকে **"সুরক্ষিত এলাকা"** হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং সেখানকার লোকজনকে আশ্রয় নিতে বলা হয়েছিল। তবে **আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ) ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে ইসরায়েলকে হামলা বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিল,** কিন্তু ইসরায়েল এই আদেশ উপেক্ষা করে হামলা চালিয়ে যায়। রাফার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে, কারণ সেখানে লাখ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল এবং শহরটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

এই হামলা এবং ইসরায়েলের সামরিক কার্যক্রমের ফলে রাফা শহরের জনগণের জন্য এক কঠিন মানবিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, এবং অনেকেই এটিকে **যুদ্ধাপরাধ** হিসেবে দেখছেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই হামলাকে **আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন** হিসেবে চিহ্নিত করে।

➤ **ধ্বংসযজ্ঞ**

- ইসরায়েলি বিমান হামলা ও আর্টিলারি হামলার ফলে রাফাহ শহরটি এক বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হয়।

- রাফাহের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, হাসপাতাল, স্কুল, এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধাগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- শহরের বেসামরিক জনগণকে হতাহত এবং আহত হতে দেখা যায়, এবং সহায়তা পৌঁছানোর জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।



ছবিতে: রাফাহ হামলার পরের অবস্থা

➤ **মানবিক সংকট**

- রাফাহের ধ্বংসযজ্ঞের পর, গাজা উপত্যকার মধ্যে মানবিক সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে।
- খাদ্য, পানি, চিকিৎসা সেবা এবং আশ্রয়ের অভাবে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে পড়ে।

রাফাহ ছিল গাজার এক গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল, যেখানে অনেক মানুষ অন্য এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছিল। তবে ইসরায়েলের এই হামলার ফলে সেখানে মানবিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো, যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অভিযোগ করেছিল যে, ইসরায়েল বেসামরিক এলাকার উপর আক্রমণ চালিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে।

এই হামলার পর, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষত আন্তর্জাতিক বিচার আদালত, ইসরায়েলকে হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু ইসরায়েল তাদের সামরিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩. সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা (২০২৩-২০২৪)

সাম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা **২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হয়।** এই হামলা শুরু হয় **হামাসের আকস্মিক আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে,** যা ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় চালানো হয়েছিল। এরপর ইসরায়েল গাজায় বড় আকারের সামরিক অভিযান চালায়, যার মধ্যে বিমান হামলা, স্থল অভিযান এবং অবরোধ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সংঘাত এখনও চলছে এবং এতে বহু বেসামরিক মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন।

➤ **উদাহরণস্বরূপ**

- জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলের বিমান হামলার ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল **২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বর।** এই হামলায় **৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন** এবং শিবিরের প্রধান বাজার ও আশেপাশের এলাকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

- **১ নভেম্বর একটি আবাসিক ভবনে হামলায় আরও ৪৫ জন নিহত** হন, যার মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

- হামলাগুলোর মধ্যে **গাজার স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে কার্যত ধ্বংস করার লক্ষ্য** রয়েছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনা করা হচ্ছে, কারণ হাসপাতালগুলো আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী রক্ষা পাওয়ার অধিকারী।

ইসরায়েল দাবি করেছে, এই হামলাগুলি হামাসের সামরিক স্থাপনা এবং ভূগর্ভস্থ টানেলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। তবে হামলাগুলি গাজায় মানবিক সংকট আরও তীব্র করেছে, যেখানে বহু বেসামরিক মানুষ নিহত এবং আশ্রয়হীন হয়েছেন। সূত্র অনুযায়ী, শিবিরের ৭০% অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে, যা গাজার এক অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত।

➤ **এদিকে ২০২৪ সালে,** গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা গাজার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, যেমন হাসপাতাল, স্কুল এবং আবাসিক এলাকা লক্ষ্য করে চালানো হয়। এর

ফলে অসংখ্য নাগরিক হতাহত হয়েছে, এবং মানবিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে।
এই হামলাগুলির মধ্যে **হাসপাতালগুলির উপর আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল।**

➤ **উদাহরণস্বরূপ**

- গাজার বিভিন্ন **স্কুলে** হামলার লক্ষ্য হয়। **৯ জুলাই ২০২৪,** ইসরায়েল **আল-আওদা স্কুলে হামলা** চালায়, যেখানে শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে কমপক্ষে **৩১ জন নিহত** হয়।

১০ আগস্ট ২০২৪, গাজা শহরের **আল-তাবেইন স্কুলে** বিমান হামলা চালিয়ে **৮০ জনের বেশি মানুষ নিহত** এবং বেশ কয়েকজন আহত হন।

- **৫ অক্টোবর ২০২৪,** ইসরায়েল কামাল আদওয়ান হাসপাতাল এবং আল-আওদা হাসপাতালকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়, যার ফলে **অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস** হয়ে যায় এবং শিশু ও চিকিৎসকরা নিহত হয়। হামলার পরে ইসরায়েলি সৈন্যরা হাসপাতালটিতে অভিযান চালিয়ে **রোগী এবং চিকিৎসাকর্মীদের আটক** করে এবং সাহায্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

- **১৩ অক্টোবর ২০২৪,** গাজার দেবির আল-বালাহর আল-আকসা মার্টার্স হাসপাতালে ইসরায়েল আক্রমণ করে।

এ ঘটনায় **শাবান আল-দালু,**১৯ বছর বয়সী একজন কোরআনের হাফেজ ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। শাবান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার জীবনযাত্রার কষ্ট ও যুদ্ধের যন্ত্রণার কথা শেয়ার করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে যুদ্ধ তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

তিনি জানান তিনি তার পরিবারসহ বার বার গৃহহীন হয়ে গাজার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি বিমান হামলায় তার মৃত্যু হয়। আগুনে দগ্ধ হওয়ার আগে তিনি হাসপাতালের আঙিনায় একটি তাবুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শাবান এই হামলার আগে

একটি মসজিদে আক্রমণের ফলে গুরুতর আহত হয়েছিলেন এবং সেখানে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

- **২০২৪ নভেম্বরের শেষদিকে,** ইসরায়েলের বিমান হামলা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। গাজার বিভিন্ন স্থানে চালানো হামলায় শত শত বেসামরিক মানুষ নিহত হয়।

⇨ **২৬ নভেম্বর:** উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় দুটি বাড়ি লক্ষ্য করে হামলায় ৭৫ জন নিহত হন।

⇨ **৩০ নভেম্বর:** গাজা শহরের শেখ রাদওয়ান এলাকায় আরেকটি হামলায় ৮ জন নিহত এবং বহু আহত হন।

ইসরায়েল দাবি করেছে যে গাজার উপর তাদের চালানো হামলাগুলো "হামাসের সামরিক স্থাপনা" এবং অস্ত্র ভাণ্ডার লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছে। এটি তাদের সামরিক কার্যক্রমের ন্যায্যতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তবে **মানবাধিকার সংস্থাগুলি** এই হামলাগুলিকে **বেসামরিক জনগণের উপর আক্রমণ** হিসেবে বিবেচনা করছে।



ছবিতে: গাজার হাসপাতালে চালানো হামলাগুলোর রিপোর্ট

➤ মানবিক সংকট

- এই হামলাগুলি গাজার মানবিক পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলে
- খাদ্য ও ওষুধ, প্রবেশে বাধা দেওয়ায় প্রায় ৮০,০০০ মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে।

এই হামলাগুলির ফলে **২০২৪ সালে গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪৪,৩০০ ছাড়িয়ে গেছে।** আন্তর্জাতিক মহল ইসরায়েলের এই কর্মকাণ্ডকে **গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ** হিসেবে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।

৪. ইয়াহিয়া আস সিনওয়ারের মৃত্যু (২০২৩-২০২৪)

বর্তমানে ইয়াহিয়া আস-সিনওয়ার এক পরিচিত নাম। ফিলিস্তিনের এই নেতা হলেন **হামাসের গাজা শাখার প্রধান,** যিনি ২০২৩ সালে তুফানুল আকসা অপারেশন এবং অন্যান্য সংঘর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে হামাস গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে লড়াই শুরু করেছে, তা অনেকটাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচিত হয়েছে।

➤ অভিযান ও নেতৃত্ব

- সিনওয়ার গাজার হামাস শাখার সশস্ত্র বাহিনী, ইয়াযুদ্দীন আল-কাসসাম ব্রিগেড, এর নেতৃত্ব দেন।
- তার অধীনে, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে সফলভাবে রকেট হামলা এবং অন্যান্য সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।
- তার নেতৃত্বে, হামাস গাজার জনগণের প্রতিরোধের শক্তি তুলে ধরে, এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করে।

➤ রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ

- সিনওয়ারের রাজনৈতিক অবস্থান ছিল আরও তীব্র, যেখানে তিনি ফিলিস্তিনির মুক্তির জন্য ইসরায়েলের প্রতি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সমর্থন জানান।
- ২০২৩ সালের রকেট হামলা ও সামরিক অপারেশনগুলি ইসরায়েলি শাসন এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের অবৈধ উপস্থিতি সম্পর্কে তার রাজনৈতিক বার্তা ছিল।

➤ সাম্প্রতিক সংঘাতের পরিণতি

- **বিনাশ ও ক্ষয়ক্ষতি:** এই সংঘর্ষের ফলে গাজার অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়, এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়। গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে ওঠে, এবং সেখানে খাদ্য ও পানি সংকট তীব্র হয়।

- **আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:** জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দেয়, তবে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে কূটনৈতিক সমাধান আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংস্থাগুলি ফিলিস্তিনিদের অধিকার লঙ্ঘন এবং বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি সহিংসতার সমালোচনা করে।

➤ **এক কিংবদন্তির মৃত্যু**

- **১৬ অক্টোবর ২০২৪,** ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এর ৮২৮ তম বিসলামাক ব্রিগেডের সদস্যরা দক্ষিণ গাজার **'তেল আল সুলতান'** এলাকায় তাদের নিয়মিত অভিযান পরিচালনার সময় তিনজন ব্যক্তিকে দৌড়াতে দেখে। এবং সৈন্যরা তাদের উপর গুলি চালায়। একবার গুলি চালালে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং একজন পাশের একটি ভবনে প্রবেশ করেন।

একটি আইডিএফ ট্যাঙ্ক ভবনটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং সৈন্যরা ভবনের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু তাদের দিকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হলে তারা পিছু হটে। এরপর আইডিএফ ভবনের ভেতরের পরিস্থিতি বোঝার জন্য **একটি ড্রোন পাঠায়** এবং এটি দেখতে পায় যে, একজন ব্যক্তি আহত অবস্থায় একটি চেয়ারে বসে আছেন, যার মুখ স্কার্ফে ঢাকা ছিল।
এরপর তারা আবারোও ভবনে গুলি চালায় এবং পরের দিন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনে **ইয়াহিয়া আস- সিনওয়ারের মৃতদেহ** দেখতে পায়। তারা মৃতদেহ থেকে একটি আঙুল কেটে শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ইসরায়েলে পাঠায়; পরে দিনের মধ্যে, লাশটিও পাঠানো হয়।
ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সিনওয়ারের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয় এবং তার মৃত্যুর পরেই ইসরায়েলি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন। একজন ইসরায়েলি প্যাথলজিস্ট রিপোর্ট করেছেন যে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং সিনওয়ার মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। **হামাসও ১৮ অক্টোবর তার মৃত্যুর কথা স্বীকার করে।**

২০২৩-২০২৪ সালের সাম্প্রতিক সংঘাত, বিশেষত তুফানুল আকসা ইয়াহিয়া আস সিনওয়ার'এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের নতুন অধ্যায় তৈরী হয়েছে। ইয়াহিয়া আস-সিনওয়ার কেবল একজন সামরিক নেতা নন, তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্ব রাখেন, ফিলিস্তিনি একতার জন্য তাঁর আপোষহীন মনোভাব এবং গাজায় অবরোধ ভাঙার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা তাকে একজন কিংবদন্তি নেতা করে তুলেছে। তাঁর আত্মত্যাগ এবং সংগ্রাম ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রতি তাঁর অটুট অনুগততা প্রদর্শন করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফিলিস্তিন সংকট: আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা,মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ও আমাদের করণীয়

ফিলিস্তিন সংকটের প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক, মানবিক, এবং ধর্মীয় কারণে সমর্থন ও চাপ তৈরি করা হয়েছে। এই সংকটের প্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একাধিক দিক থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ও মুসলিম সংস্থাগুলোর ভূমিকা

ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর জন্য অত্যন্ত জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইসরায়েলি হামলা এবং হামাসের পাল্টা আক্রমণের ফলে এই অঞ্চলে মানবিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। জাতিসংঘ (UN), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস (ICRC) সহ বিভিন্ন সংস্থা এই সংকট মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে।

বেসামরিক মানুষের জীবন ও অধিকার রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো খাদ্য, পানি, চিকিৎসা সহায়তা এবং জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একইসঙ্গে, তারা উভয় পক্ষকে মানবিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছে। তবে সংঘাতের গভীরতা এবং ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট এই প্রচেষ্টাগুলিকে বারবার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

➤ জাতিসংঘ (UN)

জাতিসংঘ ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ৭ অক্টোবরের হামলা এবং পরবর্তী ইসরায়েলি আক্রমণের পর জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ গাজার মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে একাধিক বৈঠক করেছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, জাতিসংঘ বিভিন্ন মানবিক ত্রাণ মিশন পরিচালনা করেছে। তবে, গাজায় প্রবল অবরোধ এবং সংঘাতের কারণে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর পথ

অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের পক্ষে সংকট মোকাবিলা করার পাশাপাশি তারা ফিলিস্তিনিদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্যও কাজ করে যাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গাজার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যেখানে চিকিৎসা সামগ্রী, হাসপাতাল এবং চিকিৎসক সেবা সংকটাপন্ন।

গাজায় হাসপাতালগুলোতে আহত রোগী ভর্তি করতে জায়গা সংকুলান হচ্ছে না, এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব রয়েছে। WHO গাজার মানুষের জন্য জরুরি মেডিকেল সহায়তা প্রেরণ এবং চিকিৎসা সরবরাহের জন্য কাজ করছে, তবে অবরোধ এবং সুরক্ষা ঝুঁকির কারণে তাদের কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে ।

➤ **জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ (OHCHR)**

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন বৈঠক এবং তদন্ত পরিচালনা করেছে। তারা গাজার মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর জন্য ইসরায়েল ও হামাসের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। UNHRC ফিলিস্তিনিদের অবিচার এবং অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে এবং তাদের জন্য সমর্থন জোরদার করার উদ্যোগ নিয়েছে।

➤ **ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস (ICRC)**

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস (ICRC) ফিলিস্তিনে চলমান মানবিক সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা গাজায় বেসামরিক জনগণের জন্য খাদ্য, পানি, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য জরুরি সহায়তা সরবরাহের চেষ্টা করছে। তবে, ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ, অবরোধ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তাদের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়ে পড়েছে।

এছাড়া, ICRC ফিলিস্তিনে আটক ব্যক্তিদের মানবাধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। তারা এই আটক ব্যক্তিদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রয়োগে জোর দিচ্ছে। তবে, সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি এবং চলমান রাজনৈতিক জটিলতার কারণে তাদের কাজ বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ICRC-এর প্রচেষ্টা গাজার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় কিছুটা হলেও স্বস্তি আনতে সহায়তা করছে। তাদের কাজ ফিলিস্তিনের মানবিক সংকট নিরসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

➤ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (HRW)

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ফিলিস্তিনে সংঘাতের প্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তারা গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলা এবং সশস্ত্র সংগঠনগুলির দ্বারা বেসামরিক জনগণের উপর হামলা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০২৩ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে HRW দাবি করেছে যে, ইসরায়েলি বাহিনী যুদ্ধাপরাধমূলক কার্যকলাপ করেছে, যার মধ্যে বেসামরিক এলাকাগুলোর ওপর অত্যাধিক বিমান হামলা এবং গাজার অবরোধের ফলে মানবিক সংকট সৃষ্টি করা। তাদের মতে, গাজার চিকিৎসা সেবা, খাদ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য মানবিক সহায়তা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

➤ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

ইউরোপীয় ইউ্তিনের জন্য একাধিক মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মুখে পড়েছে। EU শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমঝোতা পুনর্বহালের জন্য তৎপর রয়েছে, তবে তাদের পদক্ষেপ ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতার কারণে একাধিক বাধার সম্মুখীন হয়েছে ।

➤ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও ফিলিস্তিনে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তারা গাজার বেসামরিক লোকজনের প্রতি ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর আক্রমণ এবং হামাসের পক্ষ থেকেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে উদ্বেগ জানিয়েছে। অ্যামনেস্টি দাবি করেছে যে, ইসরায়েলি বাহিনী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন বৈধ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে এবং গাজায় চালানো আক্রমণগুলো ইহুদী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সুশৃঙ্খল এবং পরিকল্পিত যুদ্ধাপরাধ হতে পারে।

➤ আল-হাক (Al-Haq)

আল-হাক, একটি ফিলিস্তিনী মানবাধিকার সংস্থা, ইসরায়েলি বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তারা গাজায় যেসব আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে, তার ফলস্বরূপ বেসামরিক লোকজনের মৃত্যু এবং ধ্বংসাবশেষ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আল-হাক আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলেছে এবং

ফিলিস্তিনের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

ফিলিস্তিনের বর্তমান সংকটের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে নিরাপত্তা ঝুঁকি, অবরোধ এবং রাজনৈতিক জটিলতার কারণে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস (ICRC) সহ বিভিন্ন সংস্থা ফিলিস্তিনের বেসামরিক জনগণের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদান এবং অধিকার সুরক্ষায় কাজ করছে। তবে, সংঘাতের গভীরতা এবং ক্রমবর্ধমান সংকট তাদের প্রচেষ্টাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো যুদ্ধকালীন আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী ফিলিস্তিনে ন্যায্যতা, সমতা এবং সবার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। তবে রাজনৈতিক জটিলতা, অবরোধের কঠোরতা এবং নিরাপত্তার অভাবে তাদের কার্যক্রম বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা মানবিক সাহায্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, একটি ন্যায়সঙ্গত এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও সমন্বিত ও প্রভাবশালী পদক্ষেপ প্রয়োজন।

মানবিক সাহায্য, শান্তি প্রচেষ্টা, এবং আন্তর্জাতিক চাপের সমন্বয়ে ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের পথ সুগম হতে পারে। তবে, এর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী ভূমিকা নিতে হবে এবং সংঘাতের মূল কারণগুলো নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২. ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা

ফিলিস্তিনের চলমান সংঘাত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি একাধিক কারণে জটিল ও বৈচিত্র্যময়। কিছু মুসলিম দেশ সরাসরি ফিলিস্তিনের জনগণের পক্ষে শক্তিশালী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। তবে, অনেক ক্ষেত্রেই মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ স্বার্থের সংঘাত এবং ঐক্যের অভাব ফিলিস্তিনের প্রতি কার্যকর ও সমন্বিত সমর্থন প্রদানে বাধা সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বিশ্ব একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তুরস্ক, ইরান, এবং মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো ফিলিস্তিনের অধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তুরস্ক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও মানবিক সহায়তার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে, ইরান সরাসরি সামরিক সহায়তা দিয়ে থাকে, এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন প্রদানে তৎপর।

তবে, কিছু মুসলিম দেশের মধ্যে কৌশলগত স্বার্থের ভিন্নতা এবং বৈশ্বিক শক্তির সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে ফিলিস্তিন ইস্যুতে একটি অভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের বিভক্তি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই জটিলতাকে মোকাবিলা করতে, মুসলিম বিশ্বে ঐক্য এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যা ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর সমাধান নিয়ে আসতে পারে।

➤ মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক সমর্থন ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা

ফিলিস্তিনের সাথে মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে গভীর ও জটিল। মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে এবং তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে চেষ্টা করেছে। যদিও কিছু মুসলিম রাষ্ট্র তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ও ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থনের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, তবে অধিকাংশ মুসলিম দেশ ফিলিস্তিনের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র এবং রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করেছে।

- **তুরস্ক**

তুরস্কের ফিলিস্তিনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর, তুরস্ক ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ফিলিস্তিনের প্রতি তুরস্কের শক্তিশালী সমর্থন প্রদর্শন করেছেন, এবং তুরস্ক ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। তুরস্ক ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা ও তাদের ভূমি সুরক্ষার জন্য রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

- **ইরান**

ইরান ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন আরও জোরালো করেছে। ইরান বিশেষভাবে হামাস এবং ইসলামিক জিহাদসহ ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর প্রতি সামরিক এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইরান ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ব্যাপকভাবে সোচ্চার থাকে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

- **কুয়েত**

কুয়েত ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐতিহাসিকভাবে আর্থিক সমর্থন প্রদান করেছে। কুয়েতের সরকার আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ফিলিস্তিনের জন্য সমর্থন জানাতে সক্ষম হয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেছে। কুয়েত সরকার ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে সমর্থন করেছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসরায়েলের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

- **কাতার**

কাতারও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থন জানিয়ে আসছে। কাতার, বিশেষত হামাসের প্রতি তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য পরিচিত। কাতার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মানবিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রদানের জন্য কাজ করেছে।

- **আসামের অন্যান্য দেশ**

এছাড়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আলজিরিয়া, মিশর, লিবিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ফিলিস্তিনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত সৌদি আরব ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সৌদি আরব এবং অন্যান্য আরব দেশগুলোর আর্থিক ও কূটনৈতিক সহায়তা ফিলিস্তিনের সংগ্রামকে সমর্থন দেয়।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক কূটনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষত ফিলিস্তিন ইস্যুতে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিলিস্তিনের পক্ষে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করছে।

➤ **আরব লীগ ও ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)**

আরব লীগ এবং ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সমর্থনে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। OIC, ২০২৩-২৪ সালেও ফিলিস্তিনের পক্ষে বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করেছে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছে। তবে, আরব লীগের মধ্যে কিছু দেশ যেমন মিশর, জর্ডান, এবং আরব উপদ্বীপের কিছু দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করার ফলে এই সংস্থাগুলোর প্রভাব কিছুটা কমেছে। বিশেষ করে, কিছু আরব দেশ ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন দেওয়ার পাশাপাশি ইসরায়েলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করছে, যেমন বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, এবং মরক্কো।

➤ **ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন**

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, ফিলিস্তিনকে সুরক্ষিত ও মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একতাবদ্ধতা অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী ধর্মীয় নেতারা এবং আলেমরা বারবার ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য সমর্থন জানিয়ে আসছেন। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য তাদের প্রার্থনা, আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমর্থন প্রদানেও দেখা যায়। আল-আকসা মসজিদসহ

ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থান মুসলিমদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান রাখে, যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

➤ মানবিক সহায়তা ও সামাজিক উদ্যোগ

মুসলিম দেশগুলো ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা প্রদান করতে একাধিক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। তুরস্ক এবং কাতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে গাজার জনগণের জন্য ত্রাণ, চিকিৎসা এবং পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি, যেমন "কাতার রেড ক্রিসেন্ট" ও "আল-কুদস ফাউন্ডেশন", গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। তবে, গাজার ওপর ইসরায়েলের অবরোধের কারণে এই সহায়তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

➤ মুসলিম বিশ্বের ঐক্যহীনতা ও সংকট

মুসলিম বিশ্বে কিছু দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির পথে এগোচ্ছে, যা ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন কমিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে, ২০২০ সালে আমিরাত ও বাহরাইন ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যা ফিলিস্তিনের পক্ষে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যকে দুর্বল করেছে। এমনকি কয়েকটি মুসলিম দেশ ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এসব পরিবর্তন ফিলিস্তিনের প্রতি কার্যকর আন্তর্জাতিক সমর্থন সৃষ্টি করতে বাধা সৃষ্টি করেছে।

ফিলিস্তিনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা বহুমুখী এবং অনেকাংশে জটিল। কিছু মুসলিম দেশ কূটনৈতিক, মানবিক, এবং সামরিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। তুরস্ক, ইরান, এবং কাতারের মতো দেশগুলো সক্রিয়ভাবে ফিলিস্তিনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। তুরস্ক কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, ইরান সামরিক সমর্থন দিচ্ছে, এবং কাতার ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা সরবরাহ করছে।

তবে, মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের অভাব, দেশীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এই সহায়তা অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে ব্যর্থ হয়েছে। কিছু দেশ ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিরপেক্ষ অবস্থান নেয় বা বড় শক্তিগুলোর সাথে তাদের কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখতে অগ্রাধিকার দেয়, যা ফিলিস্তিনের অধিকারের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।

তবুও, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র এখনও ফিলিস্তিনের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের স্বাধিকার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হতে পারে। এই ঐক্য শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের জন্য নয়, বরং মুসলিম বিশ্বের সমন্বিত রাজনৈতিক ও মানবিক উদ্যোগের দিকেও একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩. ফিলিস্তিন সংকট ও আমাদের করণীয়

ফিলিস্তিন সংকট একটি দীর্ঘমেয়াদী, বহুমাত্রিক এবং জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা, যা শুধু ভূখণ্ড, জাতিগত বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, মানবাধিকারের প্রশ্নেও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন এবং সহানুভূতির অনেক ধরনের উপস্থাপনা দেখা যায়, কিন্তু সংকটের সমাধান যেন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এর ফলে, আমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যা শান্তির প্রচার এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।জনমতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কয়েকটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়:

ক. ধর্মীয় সংহতি ও অনুভূতি

ধর্মীয় সংহতি এমন একটি ধারণা যা একটি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য এবং সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। এটি শুধু বিশ্বাসের ভিত্তিতে একত্রিত হওয়া নয়, বরং একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, সম্মান এবং সহমর্মিতা অনুভব করা। ইসলামে, বিশেষ করে, ধর্মীয় সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মুসলিম উম্মাহর একতা এবং শক্তির মূল ভিত্তি।

ফিলিস্তিন মুসলিম বিশ্বের কাছে কেবল রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটি ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদের কারণে একটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ইস্যু। ফিলিস্তিন সংকটের প্রেক্ষাপটে, মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় সংহতি এবং অনুভূতির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিনিরা, যারা মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত একটি পবিত্র ভূমিতে বসবাস করে, সেই জমি রক্ষা এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে সহানুভূতি এবং ঐক্য প্রদর্শন করার জন্য মুসলিম বিশ্ব একত্রিত হয়েছে। এই একতার মাধ্যমে মুসলিমরা প্রমাণ করেছে যে ধর্মীয় অনুভূতি ও সংহতি জাতিগত বা রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে, তাদের সহমর্মিতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

খ. বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ

- **শারীরিক প্রতিবাদ:** ফিলিস্তিন সংকটের দীর্ঘকালীন অবস্থা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। এসব প্রতিবাদ মুসলিম বিশ্বের মানবাধিকার এবং ন্যায়ের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচায়ক হিসেবে উঠে আসে। দেশভিত্তিক দৃষ্টিতে তুরস্ক,

ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ফিলিস্তিনের পক্ষে নিয়মিত জনসমাবেশ এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। গণ-প্রতিরোধের জন্য রাস্তায় নেমে আসে মানুষ। বহু মুসলিম দেশেই প্রতিবাদে যোগ দিতে মানুষ রাস্তায় শামিল হয়, মিছিল বের হয়, এবং দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে।

- **রাজনৈতিক প্রতিবাদ:** ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ফিলিস্তিনের প্রতি আরো একীভূত সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানান, এবং রাজনৈতিক ভাবে ফিলিস্তিনের পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে।

গ. প্রতিবাদী আন্দোলনের কৌশল

ফিলিস্তিন সংকটের প্রতি প্রতিবাদী আন্দোলনগুলো নানা কৌশল ব্যবহার করছে, যার মধ্যে রয়েছে শারীরিক, ভার্চুয়াল, এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরাইলি দখলদারি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরি করা এবং চাপ সৃষ্টি করা।

১. ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোশ্যাল মিডিয়া

- **সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্রতিবাদ:** বিশ্ব মুসলিম জনগণের মধ্যে ফিলিস্তিনের প্রতি সহানুভূতি আরও শক্তিশালী হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, যেখানে বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনের অবস্থা নিয়ে প্রচার হয়। বিশেষ করে, টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটক প্ল্যাটফর্মগুলোতে ফিলিস্তিনের সমর্থনে প্রচুর পোস্ট, ভিডিও এবং তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে, যা তরুণ মুসলিম প্রজন্মকে একত্রিত করতে সহায়তা করেছে।

- সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানাতে **#FreePalestine**, **#BoycottIsrael** হ্যাশট্যাগ এবং অন্যান্য প্রচারণার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ ভার্চুয়ালভাবে যোগ দিয়েছে।

- সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম ফিলিস্তিনের সংকট তুলে ধরতে এবং ইসরাইলের আগ্রাসন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে মানুষ সহজেই তথ্য শেয়ার করতে পারছে, যা ফিলিস্তিনের সংকটের বৈশ্বিক সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করেছে। এছাড়া, ভিডিও কনটেন্ট এবং গ্রাফিক্সের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের জীবনযাত্রা এবং ইসরাইলের আগ্রাসন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জনসাধারণকে আরো বেশি জানানো হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া এখন শুধু একটি তথ্য আদান-প্রদান মাধ্যম নয়, এটি একটি গ্লোবাল প্রতিবাদ ও সংহতির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

২. বয়কট আন্দোলন

ফিলিস্তিন ইস্যুতে বয়কট আন্দোলন, যাকে "Boycott, Divestment, and Sanctions" তথা **BDS আন্দোলন**ও বলা হয়, ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলির দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসরায়েলের দখলদারি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা। এই আন্দোলন মূলত ইসরায়েলি পণ্য, কোম্পানি, শিক্ষাবিদ, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বয়কটের মাধ্যমে ইসরায়েলকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়।

ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানে বয়কট আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বয়কট আন্দোলন আন্তর্জাতিক জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সমর্থন লাভ করতে সহায়ক হতে পারে।

➤ বয়কট আন্দোলনের সূচনা (২০০৫)

২০০৫ সালে ফিলিস্তিনিরা একযোগে BDS আন্দোলনের ঘোষণা দেন। তাদের দাবি ছিল:

- ইসরায়েলের দখলকৃত ভূমি থেকে সেনা প্রত্যাহার করা।
- ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- ইসরায়েলি নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য ও অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা।

এই আন্দোলন গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী ইসরায়েলি কোম্পানিগুলোর পণ্য, সেবা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অন্য ইসরায়েলি উদ্যোগে অংশগ্রহণ বন্ধ করার মাধ্যমে।

➤ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া (২০০৫-২০১০)

প্রাথমিকভাবে, বয়কট আন্দোলন কিছু সফলতা পেয়েছিল, তবে আন্তর্জাতিকভাবে ইসরায়েলি সরকার এবং তাদের সমর্থকরা এটিকে "অ্যান্টি-সেমিটিজম" বা ইহুদি বিরোধিতার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীরা বার বার জানিয়েছেন, এটি শুধুমাত্র ইসরায়েলি দখলদারিত্ব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

➤ বিশ্বব্যাপী প্রসার (২০১০-২০২০)

এই আন্দোলন ২০১০ সাল থেকে বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, যখন অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্পী, লেখক এবং বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ইসরায়েলি সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করেন। ২০১৪ সালে গাজার আক্রমণের পর, অনেক পশ্চিমা দেশে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরও তীব্র বয়কট আন্দোলন শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের একাডেমিক সম্পর্ক ইসরায়েলি শিক্ষাবিদদের সাথে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, এবং অনেক কোম্পানি তাদের ইসরায়েলি প্রকল্প এবং পণ্য বয়কট করে।

➤ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্রীড়াঙ্গনে বয়কট (২০১৫-২০২০)

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি, ক্রীড়া বিশ্বেও বয়কট শুরু হয়। ইসরায়েলি ফুটবল ক্লাবগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বাতিল করা হয়, এবং ক্রীড়া সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বয়কটের ডাক দেয়া হয়।

➤ ২০২৩-২০২৪ সালের বয়কট আন্দোলন

২০২৩ সালে, গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পর বয়কট আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী অনেক সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং মানবাধিকার গোষ্ঠী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বয়কটের সমর্থন জানান।

বিশ্বজুড়ে BDS আন্দোলন একাধিক ইসরায়েলি কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে কাজ করে, এবং এমনকি আরব বিশ্বের অনেক দেশের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়। তবে ইসরায়েল ও তার মিত্র দেশগুলো এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং "ইহুদি বিরোধী" হিসেবে উল্লেখ করে।

➤ **২০২৩ সালে বয়কট আন্দোলনের প্রধান ঘটনা**

- **বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে বয়কট:** অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন ইসরায়েলি শিক্ষাবিদ ও শিল্পীদের সম্মাননা দিতে অস্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ইসরায়েলি গবেষকদের সাথে একাডেমিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ইসরায়েলের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোনো সহযোগিতা করেনি।

- **পণ্য ও কোম্পানির বয়কট:** ২০২৩ সালে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কোম্পানি, বিশেষত যারা ইসরায়েলের দখলদারি অঞ্চলে ব্যবসা চালায়, তাদের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। এটি বিশেষভাবে ইসরায়েলি বসতি নির্মাণে সহায়তাকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ছিল, যেমন গুগল, ইন্টেল, হেলিওস্ট্যাট এবং অন্যান্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।

- **ক্রীড়াঙ্গনে বয়কট:** ক্রীড়াঙ্গনে বয়কট আন্দোলনও বৃদ্ধি পায়, যেখানে বিশ্বজুড়ে অনেক ফুটবল ক্লাব এবং ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ইসরায়েলি ক্লাবগুলোর সাথে ম্যাচ বা সহযোগিতা বাতিল করে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলি ইসরায়েলি দলের সাথে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

- **জাতিসংঘের পদক্ষেপ:** জাতিসংঘ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি ২০২৩ সালের শেষের দিকে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার বিরুদ্ধে বয়কটের আহ্বান জানায়, এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারকে প্রতিবাদ জানাতে উৎসাহিত করে।

➤ **বয়কটের প্রতিক্রিয়া**

২০২৩ সালে বয়কট আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ইসরায়েলি সরকার এবং তাদের সমর্থকরা এই বয়কটকে সমালোচনা করেছেন এবং এটি "অ্যান্টি-সেমিটিজম" বা ইহুদি বিরোধিতার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে, বয়কট আন্দোলনকারীরা মনে করেন এটি একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, যার মাধ্যমে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা এবং ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২০২৩ সালে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর, বয়কট আন্দোলন বিশ্বজুড়ে আরো গতি পায় এবং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার ক্ষেত্রের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

➤ অন্যতম প্রধান সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ (২০২৪)

২০২৪ সালে BDS আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনে এখনও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিশেষত, গাজা অঞ্চলের পরিস্থিতি এবং পশ্চিম তীরের অব্যাহত দখলদারি এক নতুন পর্বে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। যদিও ইসরায়েলি সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক চাপের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তবে ফিলিস্তিনের পক্ষ থেকে আন্দোলনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে কাজ করছে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী বয়কট আন্দোলন ২০২৪ সালেও ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ হিসেবে চলতে থাকবে।

ঘ. মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রম

ফিলিস্তিনের দীর্ঘস্থায়ী সংকটে মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত ফিলিস্তিনে খাদ্য, ওষুধ এবং আশ্রয়ের মতো জরুরি সহায়তা পাঠানো হয়। এ ধরনের উদ্যোগে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ইসরাইলি দখলদারি এবং সংঘাতের কারণে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি নিরূপায় হয়ে মানবিক সহায়তা গ্রহণ করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, যেমন ইউএনআরডব্লিউএ (UNRWA), বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের জন্য সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সরবরাহ, পানি এবং আবাসনসহ মানবাধিকার সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

➤ জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা

জাতিসংঘের ইউএনআরডব্লিউএ (UNRWA) ফিলিস্তিনিদের জন্য মূল সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিম তীর, গাজা, সিরিয়া, লেবানন এবং জর্ডানে ৫ মিলিয়নেরও বেশি শরণার্থীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সেবা প্রদান করে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা, আশ্রয় ও শরণার্থী ক্যাম্পে পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত।

➤ আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা

রেড ক্রস, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP) এবং ডক্টরস উইথআউট বর্ডারস (MSF) (Médecins Sans Frontières) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলি ফিলিস্তিনে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টিম পাঠানো, বিশেষ করে গাজা উপত্যকায়, এই সংস্থাগুলির মূল কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।

➤ ত্রাণের চ্যালেঞ্জ এবং বাধা

তবে, মানবিক সহায়তা প্রদানেও অনেক বাধা রয়েছে। ইসরাইলি অবরোধ এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে গাজা এবং পশ্চিম তীরে ত্রাণ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। অসংখ্য বেসামরিক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খাদ্য, চিকিৎসা এবং আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া, মানবিক সহায়তাকারী সংস্থাগুলি ইসরাইলি সেনাবাহিনীর হামলার শিকার হয়, যা তাদের কার্যক্রমকে আরও কঠিন করে তোলে।

ফিলিস্তিনের সংকট পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক এবং মুসলিম সংস্থাগুলোর মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অবরোধ এবং নিরাপত্তা সমস্যা সহায়তা প্রদানকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

ফিলিস্তিন সংকট দীর্ঘদিন ধরে মানবিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সংকটে পরিণত হয়েছে, যা শুধুমাত্র ওই অঞ্চলের জনগণের জন্য নয়, বরং বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও একটি গুরুতর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতো জাতিসংঘ, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস এবং অন্যান্য সংস্থা বিভিন্ন সময়ে ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নানা রাজনৈতিক কারণে তাদের প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে সংঘাতের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং আন্তর্জাতিক শক্তির, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর, দ্বৈত মানদণ্ড পরিস্থিতি আরও কঠিন করে তুলেছে।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ঐক্যবদ্ধ হলেও, রাজনৈতিক কারণে কিছু বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং কিছু দেশ সক্রিয়ভাবে এই সংকটের সমাধানে অংশ নিয়েছে। তবে, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কখনো কখনো স্বার্থের বিরোধ এবং নীতি-গত অমিলের কারণে সমন্বিত উদ্যোগ ব্যাহত হয়েছে।

আমাদের করণীয় হিসেবে, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানাতে সোশ্যাল মিডিয়া, মানবিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, সোশ্যাল মিডিয়ায় আন্দোলন সমর্থন করা এবং রাজনৈতিক স্তরে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফিলিস্তিন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব।

➤ আল্লাহর কাছে দুআ করা

দুআ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার, যা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই।
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

"দুআ হচ্ছে মুমিনের হাতিয়ার।"
মুসলিম উম্মাহর উচিত, প্রতিটি মুহূর্তে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য দুআ করা। আল্লাহর কাছে তাদের মুক্তি, শান্তি, সহায়তা এবং শক্তি কামনা করা। আমাদের উচিত প্রতিদিনের ইবাদত, বিশেষ করে সলাত ও সিয়াম এবং রাতের তাহাজ্জুদ নামাযে আল্লাহর কাছে ফিলিস্তিনের মুক্তি প্রার্থনা করা।

➤ সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা

ফিলিস্তিনের সংকট শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের সমস্যা নয়, এটি পুরো মুসলিম উম্মাহর সমস্যা। মুসলিমরা একত্রিত হয়ে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করতে পারে।

- আমাদের উচিত সামাজিক গণমাধ্যমে, মসজিদে, স্কুল-কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফিলিস্তিনের সংকট সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

- ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার করা, যাতে মানুষ বুঝতে পারে ইহুদী দখলদারিত্ব এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবিচারের প্রকৃতি।

- **অভ্যন্তরীণ প্রচারণা:** মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ইমামদের মাধ্যমে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

➤ অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান

ফিলিস্তিনের মানবিক সংকট সমাধানে আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **মানবিক সহায়তার সংগঠনগুলোকে সহযোগিতা:** আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো যেমন: ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস (ICRC), মুসলিম এইড, আল-আকসা ফাউন্ডেশন, ইত্যাদি মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের সাহায্য পাঠানো।

- **স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা:** যারা ফিলিস্তিনের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক ও অন্যান্য উপায়ে সহায়তা প্রদান করা।

- **সামাজিক উদ্যোগগুলোতে অবদান রাখা:** ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের জন্য বিভিন্ন সাহায্যমূলক উদ্যোগে যুক্ত হওয়া।

➤ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা গঠন করা

মুসলমানদের মধ্যে একতা থাকা জরুরি। ফিলিস্তিনের সংকটের সমাধান আসবে কেবল তখনই, যখন মুসলিম উম্মাহ একত্রিত হবে।

- **একটি আন্তর্জাতিক ফিলিস্তিন কমিটি গঠন করা:** মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ নেতারা যদি একত্রিত হয়ে ফিলিস্তিনের বিষয়টি মোকাবেলা করেন তবে বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিনের প্রতি ন্যায়ের দাবি আরও বেশি জোরালো হবে।

➤ **তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা**

- তরুণ প্রজন্মকে ফিলিস্তিনের মুক্তির আন্দোলনে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা উচিত।

- **তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ও মানবিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা:** স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আলোচনা আয়োজন করা।

- **তাদেরকে দুআ, তাওবা এবং অন্যান্য ইবাদত শেখানো:** যাতে তারা নিজেদের কর্তব্য জানে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করে।

➤ **আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন**

আমরা যতই প্রয়াস চালাই, যতই পদক্ষেপ গ্রহণ করি, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সমস্ত সমস্যা ও সংকটের সমাধান রেখেছেন, যদি আমরা তার দিকে ফিরে যাই এবং তাকে আমাদের সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করি।

- **আল্লাহর কাছে তাওবা করাঃ** আমাদের উপর যে সকল দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে, তা আমাদের গুনাহের ফলও হতে পারে। তাই আমাদের প্রথম কাজ হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা। আমরা যেন আমাদের গুনাহ থেকে ক্ষমা চাই এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাই। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

"এবং তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো, হে বিশ্বাসীগণ, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা নূর, ২৪:৩১)

তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য লাভের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাব।

- **আল্লাহর সাহায্য কামনা করাঃ** বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপরে ক্ষমতাশালী। আমাদের শুধু তাকে ডাকতে হবে, তাকে সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করতে হবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِا لْحَقِّ ؕ وَاِ نَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

"তোমাদের যে কোনো বিপদ আসুক না কেন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৫২)

আমরা যেন আল্লাহর কাছে দুআ করি, ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ তাআলা যেকোনো সংকট থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম।

- **আল্লাহর উপর ভরসা রাখাঃ** আমাদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং তাঁর সাহায্য কামনা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের কখনো একা ছেড়ে যান না। তিনি তার প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করেন, যদি তারা তাকে ডাকেন। আল্লাহ বলেন,

- قَا لَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَا فُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَا بَ ۚ فَاِ ذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِ نَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৩)

আমাদের দুঃসময়ে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য আমাদের আস্থা ও ভরসা তাঁর উপর পূর্ণ রাখতে হবে।

- **আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়াঃ** ফিলিস্তিনসহ মুসলিম বিশ্বের সমস্যাগুলোর সমাধান আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই হতে পারে। আমাদের উচিত ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করে, সঠিক পথে ফিরে আসা। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا مَرِضْتُ فَادْعُوْنِى"

"যখন তোমরা কোন সমস্যা বা বিপদে পড়বে, তখন আল্লাহকে ডাকো।" (সুনান আবু দাউদ)

তাহলে, আমাদের উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্যের জন্যই নয়, নিজেদেরকে তাঁর পথে ফিরিয়ে এনে, তাঁর সান্নিধ্যে থাকার জন্যও কাজ করা।

ফিলিস্তিনের সংকট সমাধানে আমাদের দায়িত্ব একমাত্র একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের উচিত দুআ, সামাজিক আন্দোলন, আন্তর্জাতিক চাপ, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানো। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন, যেন আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারি এবং ফিলিস্তিনের জনগণের মুক্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারি। তবে, ফিলিস্তিনের সংকট বা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোনো সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র মানবিক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়; আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুই হতে পারে না। আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, তার দিকে ফিরে যাওয়া এবং ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। যখন আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করি, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের পথ প্রদর্শন করেন এবং আমাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফিলিস্তিনের প্রতি মুসলিম উম্মাহর দায়বদ্ধতা

ফিলিস্তিন সংকট কেবল রাজনৈতিক বা সামরিক সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক সংকট। মুসলমানদের জন্য এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব এবং মানবতার প্রতি কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআনে বলেছেন:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

"তোমাদের কী হয়ে গেল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর না এবং নিষ্পেষিত লোকদের পক্ষে, যারা এই দুআ করছে যে, আয় আল্লাহ! আমাদের সেই বসতি থেকে উদ্ধার করুন, যার অধিবাসী জালেম। আর আপনি আমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করে দিন।" (সূরা নিসা, ৪: ৭৫)

এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের এগিয়ে আসা এবং আল্লাহর রাস্তায় সক্রিয় হতে হবে। আমরা যদি একে অপরকে সহযোগিতা করি এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করি, তবে ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হবো এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির পথে অবদান রাখতে পারবো।

মুসলিম উম্মাহর করণীয় সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াত ও হাদিস সমূহ

১. কোরআনের আয়াতসমূহ

- **ওরা মাজলূম : প্রতিরোধ ওদের আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার**

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَ نَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗوَاِ نَّ اللهَ عَلٰى نَـصْرِهِمْ لَـقَدِيْرُ • اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَا رِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللهُ ۗوَلَوْلَا دَ فْعُ اللهِ النَّا سَ بَعْضَهُمْ بِبَـعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَا مِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا ۗوَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗاِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ•

তাদেরকে অন্যায়ভাবে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু তাদের এ কথা বলার কারণে যে, 'আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।' আল্লাহ যদি মানুষদের এক দলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রীষ্টান সংসারত্যাগীদের উপাসনালয়, গির্জা ও ইয়াহূদীদের উপাসনার স্থান আর মাসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে, আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রান্ত। সূরা হজ্ব : ৩৯-৪০

- **ওদের অপরাধ ওরা মুমিন! আল্লাহ সব দেখছেন**

وَ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اللهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

তারা মুমিনদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল কেবল এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী, প্রশংসার্হ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব যার মুঠোয় এবং আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন। -সূরা বুরূজ (৮৫) : ৮-৯

- **এই তো ক্ষতবিক্ষত মুসলিম শিশুর লাশের সারি; তবুও কি জাগবে না!**

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের জন্য এর কী বৈধতা আছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেইসকল অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, যারা দুআ করছে, 'হে আমাদের

প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে-যার অধিবাসীরা জালিম-অন্যত্র সরিয়ে নাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও? -সূরা নিসা (০৪) : ৭৫

- **হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَي اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ فَاٰمَنَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآىِٕفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাইলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফর অবলম্বন করল। সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল। -সূরা সফ (৬১) : ১৪

- **হে মুমিন! তোমার ব্যবসা লাভজনক হোক**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰي تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ، تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَ اُخْرٰي تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়- যদি তোমরা উপলব্ধি কর। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য। আর তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস, (তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়! -সূরা সফ (৬১) : ১০-১৩

- **হে মুমিন! তুমি তো আল্লাহর সাথে জান-মালের সওদা করেছ!**

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ وَ مَنْ اَوْفٰي بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে- এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে ও নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সঙ্গে যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য। -সূরা তাওবা (০৯) : **১১১**

- **মানুষের দেখানো ভয়ে মুমিনরা ভীত নয়, তারা তো বলে- 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'**

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ.

যাদেরকে লোকে বলেছিল, লোকেরা তোমাদের (সাথে যুদ্ধ করার) জন্য সেনা সংগ্রহ করেছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। তখন এটা (এই সংবাদ) তাদের ঈমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে ওঠে- 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'-আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। -সূরা আলে ইমরান (০৩) : **১৭৩**

- **তোমার শুধু চেষ্টা, কাজটি আল্লাহ্ই করবেন**

وَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللهَ رَمٰي.

(হে নবী!) তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তা তুমি নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন। -সূরা আনফাল (০৮) : **১৭**

- **হীনবল হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে!**

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে। -সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৩৯

وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

এবং নিশ্চয়ই আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত। -সূরা সফ্ফাত (৩৭) : ১৭৩

- **হে মুমিন! ইহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ?!**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤي اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তারা পরস্পরে একে অন্যের বন্ধু! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না। -সূরা মায়িদা (৫) : ৫১

- **ওরা তোমাদেরকে গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের ধর্ম মেনে নেবে!**

وَ لَنْ تَرْضٰي عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰي حَتّٰي تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَي اللهِ هُوَ الْهُدٰي وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ.

ইহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হেদায়েত তো আল্লাহরই হেদায়েত। তোমার কাছে (ওহীর মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না। -সূরা বাকারা (০২) : ১২০

- **ওরা আল্লাহকে যতটুকু ভয় পায় না পায়, তোমাদেরকে ভয় পায় আরো বেশি**

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ.

(হে মুসলিমগণ!) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের বুঝ-সমঝ নেই। -সূরা হাশর (৫৯) : ১৩

- **ওরা ভীতু; চার দেয়ালের যোদ্ধা!**

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّ قُلُوْبُهُمْ شَتّٰي ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ.

তারা সকলে একাট্টা হয়েও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, তবে এমন জনপদে (করবে), যা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত অথবা (করবে) দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে। তাদের আপসের মধ্যে বিরোধ প্রচণ্ড। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর, অথচ তাদের অন্তর বহুধা বিভক্ত। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের আকল-বুদ্ধি নেই। -সূরা হাশর (৫৯) : ১৪

- **তোমাদের হাতেই আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন**

. قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন।
সূরা তাওবা (০৯) : ১৪

-
-

- **শহীদের এ মিছিল দেখে বিচলিত হয়ো না, শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হবেই**

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَ لِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ، وَ لِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ .

তোমাদের যদি আঘাত লেগে থাকে, তবে তাদেরও অনুরূপ আঘাত (ইতিপূর্বে) লেগেছিল। এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহীদ করা। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালবাসেন না। এবং (উদ্দেশ্য ছিল এ-ও যে,) আল্লাহ মুমিনদেরকে যাতে পরিশুদ্ধ করতে পারেন ও কাফেরদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন। -সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৪০-১৪১

- **তোমরা সংখ্যায় কম তাতে কী হয়েছে?**

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللهِ وَ اللهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ .

এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে! আর আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন, যারা সবরের পরিচয় দেয়। -সূরা বাকারা (০২) : ২৪৯

- **তাদের দূর্গ তাদের রক্ষা করতে পারবে না**

مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللهِ فَاَتٰىهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ.

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করনি, তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে এলেন, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন।... -সূরা হাশর (৫৯) : ২

- **মুমিনদের প্রার্থনা**

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি সেই রকমের দায়িত্বভার অর্পণ করো না, যেমন তা অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন ভার চাপিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের (ত্রুটিসমূহ) মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। -সূরা বাকারা (০২) : ২৮৬

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর সবরের গুণ ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ, আর কাফির সম্প্রদায়ের ওপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। -সূরা বাকারা (০২) : ২৫০

- **আল্লাহর রহমতের কাছে মুমিনদের প্রত্যাশা**

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ.

(সত্য কথা এই যে,) এই দল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালাবে। -সূরা কামার (৫৪) : ৪৫

২. হাদিস সমূহ

- **মুসলিম তো এমন!**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

পারস্পরিক ভালবাসা-সম্প্রীতি, দয়া-রহম, সহমর্মিতা ও সমব্যথী হওয়ার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত এক দেহের মতো, যার কোনো একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে বা অসুস্থ হলে পুরো দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে কাতর হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৬

- **মুসলিমগণ কি তাদের ভাইদের মাজলুম অবস্থায় শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে পারে?**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُه وَلاَ يُسْلِمُه.

মুসলিমগণ একে অপরের ভাই, কোনো মুসলিম অপর ভাইয়ের ওপর জুলুম করতে পারে না, তাকে শত্রুর মোকাবেলায় সহায়তা না করে সঙ্গহীন একা ছেড়ে দিতে পারে না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৪২

- **প্রতিরোধ হবে সকল মুসলিম মিলে**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضًا.

মুমিনগণ পরস্পরে দেয়ালের মতো, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তি জোগায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫

- **মুজাহিদদের সহযোগিতা করে আমরাও হতে পারি জিহাদে অংশগ্রহণকারী**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমনকারী কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করবে, সে জিহাদে শামিল। যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমনকারী মুজাহিদের রেখে যাওয়া পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করবে, সেও জিহাদে শামিল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৮৪৩

হে আল্লাহ! মুক্ত কর আমাদের 'ওয়াহ্ন' থেকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا.

অচিরেই (এমন একটা সময় আসছে, যখন) বিভিন্ন জাতি একে অপরকে ডেকে তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হবে, যেমন আহারকারীরা একে অপরকে খাবারের পাত্রের দিকে ডেকে নিয়ে আসে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন-

وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟
সেদিন কি আমাদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে এমনটা হবে?

তিনি বললেন-

بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ.
বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় হবে অনেক। তবে তোমাদের অবস্থা হবে পানির তোড়ে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো। আল্লাহ তাআলা দুশমনের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি উঠিয়ে নেবেন আর তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহ্ন' (দুর্বলতা) সৃষ্টি করে দেবেন।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন-

يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟
আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহ্ন' মানে কী?

তিনি বললেন-
حُبّ الدّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.
দুনিয়ার মোহ আর মৃত্যুর ভয়। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৯৭

সপ্তম অধ্যায়ঃ ফিলিস্তিন ও ইসলামের শেষ জামানা

ইসলামী শেষ জামানার ধারণা মুসলিম বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, একটি সময় আসবে যখন **"পৃথিবীতে সর্বশেষ যুদ্ধ, চূড়ান্ত উত্তরাধিকার এবং ইসলামিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"** এই তত্ত্বে বিশেষভাবে ফিলিস্তিন, আল-আকসা মসজিদ এবং মক্কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে, এই স্থানগুলি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবে অত্যন্ত সম্মানিত।

➤ **আল-আকসা মসজিদ এবং আল-কুদুসের গুরুত্ব**

বিশ্বস্ত হাদীস অনুসারে, প্রলয়ের দিনে আল-আকসা মসজিদ এবং আল-কুদুস শহরের ভূমি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটি ঐতিহাসিকভাবে একাধারে ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলিমদের পবিত্র স্থান হিসেবে পরিচিত, কিন্তু ইসলামী ভাবনায় এটি মহাকাব্যিক তাৎপর্য বহন করে। ইমাম মাহদির আগমন এবং শেষ যুদ্ধের সময় ফিলিস্তিন এবং আল-আকসা মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হবে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

শেষ জামানায় ফিলিস্তিন ও রাসূল (সাঃ)- এর শেষ সময়ের ভবিষ্যৎ বাণী

ইসলামের **"শেষ জামানা"** (Eschatology) ইসলামিক বিশ্বাসের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা পৃথিবীর শেষ সময়ের ঘটনাবলী এবং আল্লাহর সৃষ্টির চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে। ইসলামী ধর্মীয় ঐতিহ্যে, ফিলিস্তিন এবং বিশেষত আল-আকসা মসজিদ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলিমদের বিশ্বাসে, **আল-আকসা মসজিদ এবং ফিলিস্তিনের ভূমি ইসলামের শেষ বিজয়ের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়।**

ইসলামের শেষ জামানা সম্পর্কে যা বলা হয়, তার মধ্যে আল-কুদুস বা জেরুজালেম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, এই শহরটি কিয়ামতের (প্রলয়ের দিন) মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি শুধুমাত্র একটি পবিত্র শহর নয়, বরং ইসলামের শেষ সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর কেন্দ্রে রয়েছে।

➤ হাদিসে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধের কথা

- রাসুল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে,

কিয়ামতের আগে অবশ্যই এই ইহুদি জাতি মুসলিমদের হাতে পরাজিত হবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২৬৩৪৩)।

- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ . إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ " .

'কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করবে। মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইয়াহুদি আমার পশ্চাতে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ এ হচ্ছে ইয়াহুদিদের গাছ। (মুসলিম, হাদিস ৭০৭৫)

➤ মুসলিমদের দ্বিতীয় হিজরতভূমি/ শেষকালের হিজরতভূমি

ইসলামে হিজরত বলতে সাধারণত রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাদের মক্কা থেকে মদিনার হিজরতকে বোঝায়। নববী জীবনের ত্রয়োদশতম বছরে সংঘটিত হলো মক্কা থেকে মদিনার হিজরত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শামের লোকজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হবে এবং তাদের দিকে সংঘটিত হবে আরেকটি মহা হিজরত।

- আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে এক হিজরতের পর আরেকটি হিজরত সংঘটিত হবে। তখন উত্তম মানুষ তারাই হবে, যারা ওই জায়গায় হিজরত করবে, যে জায়গায় হযরত ইবরাহিম (আ.) হিজরত করেছিলেন।

- অপর এক বর্ণনায় এসেছে—

এ ধরাপৃষ্ঠে তারাই সর্বোত্তম যারা হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর হিজরতের স্থানকে নিজেদের হিজরতস্থল বানাবে। এ সময় কেবল মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘৃণা করবেন। অতঃপর একটি আগুন তাদেরকে বানর ও শুকরের দলসহ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানে রাতযাপন করবে, আগুনও সেখানে রাত কাটাবে। আর যেখানে তারা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম করবে, আগুনও সেখানে বিশ্রাম করবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২১২৩) আবু দাউদ, হাদিস : ২৪৮২

➤ বীর-মহাবীর দেশ ও সত্যবাদী দলের অবস্থান ফিলিস্তিন

বাইতুল মাকদিস এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বদা এমন একটা জামাতের উপস্থিতি থাকবে, যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ফিলিস্তিনি জাতি মাটি কামড়ে লড়ে যাওয়া নিবেদিত লড়াকু হাজারো বীরের দেশ। ইতিহাসের মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আয়ুবি ও বাইবার্সের দেশ ফিলিস্তিন। এ পবিত্র ভূমিতে কেয়ামত অবধি মায়েদের কোল আলোকিত করে জন্ম নেবে— হাজারো রথী-মহারথী ও বীরপুরুষ। মুজাহিদরা কেয়ামত পর্যন্ত নিবেদিত থাকবেন— ফিলিস্তেনর মাটিতে।

- হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে। শত্রুর মনে পরাক্রমশালী থাকবে। দুর্ভিক্ষ ছাড়া কোনো বিরোধী পক্ষ তাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত পর্যন্ত তারা এমনই থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কোথায় থাকবেন? রাসুল (সা.) বললেন, 'তারা বায়তুল মাকদিস এবং তার আশপাশে থাকবেন।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩২০; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৭৬৪৩)

- নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন—

رواه عبد الله بن أحمد في المسند وجادة عن خط أبيه، والطبراني، ورجاله ثقات.

- অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য। —(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৫৬৪)

➤ মুসলমানদের সেনাছাউনি

একসময় মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হবে। দামেস্ক নগরী আর তাদের সেনাছাউনি হবে। তার পার্শ্ববর্তী গোতা নগরী।

- আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

মহাযুদ্ধের সময় মুসলিমদের ছাউনি হবে গোতা শহরে, যা দামেস্ক শহরের পাশে অবস্থিত। এটি শামের উৎকৃষ্ট শহরগুলোর একটি। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৯৮)

- অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

অচিরেই তোমরা শাম বিজয় করতে পারবে, যখন তোমাদের সেখানে বসবাসের এখতিয়ার দেওয়া হবে, তোমরা দামেস্ক নগরীকে বাসস্থান বানাবে, কেননা তা যুদ্ধবর্তীকালীন মুসলিমদের আশ্রয়স্থল হবে, আর তাদের ছাউনি হবে সে দেশের একটি ভূমি, যাকে গোতা বলা হয়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৭৪৭০)

➤ হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই

পৃথিবীতে মানব জাতির যাত্রালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের লড়াই, সত্য ও মিথ্যার সংঘাত। এটা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই হবে বাইতুল মাকদিস অঞ্চলে।

- আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমগণ ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে আর মুসলিমগণ তাদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা যে পাথর বা গাছের পেছনেই আত্মগোপন করবে, সে পাথর বা গাছও বলে উঠবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পেছনে ইহুদী আছে। এসো তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ গাছ কিছু বলবে না; কারণ এটা ইহুদীদের গাছ। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯২২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯২৬

- ইমাম নববী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, **'গারকাদ'** একধরনের কাঁটাদ্বার গাছ, যা বাইতুল মাকদিসে প্রচুর পরিমাণে হয়। আর সেখানেই দাজ্জাল ও ইহুদী বধের ঘটনা ঘটবে। (. শরহে মুসলিম, নববী ১৮/৪৫)

➤ ইমাম মাহদির আবির্ভাব

ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসগুলোর একটি। ইমাম মাহদী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করবেন, পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে পূর্ণ করবেন এবং অবিচার ও জুলুম দূর করবেন। তার নেতৃত্বে মুসলিমরা **দাজ্জালের আগমনের আগে প্রস্তুতি** নেবে। তাঁর আবির্ভাবের সময় ফিলিস্তিনের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম ধর্মীয় চিন্তাভাবনা অনুসারে, ইমাম মাহদি এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে বিশেষ প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সংগ্রাম ও যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

"মাহদী আসবেন আমার বংশধর হতে। তাঁর কপাল হবে উজ্জল এবং নাক হবে উঁচু। পৃথিবী হতে যুলুম-নির্যাতন দূর করে দিয়ে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দিবেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করবেন"।(*আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাহদী, সহীহুল জামে আস্ সাগীর, হাদীছ নং- ৬৬১২।)*

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

"সেদিন কেমন হবে তোমাদের অবস্থা যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়াম নেমে আসবেন এবং তোমাদের মধ্যে হতেই একজন ইমাম হবেন"। অর্থাৎ তোমাদের সাথে জামা'তে শরীক হয়ে ঈসা (আঃ) তোমাদের ইমামের পিছনে নামায আদায় করবেন। (বুখারী)

➤ শেষ যুদ্ধ ও ইসলামের বিজয়

ইসলামিক বিশ্বাস অনুসারে, মাহদি আসবেন যখন পৃথিবীতে বিশাল অরাজকতা এবং অশান্তি সৃষ্টি হবে। ইমাম মাহদির আগমনের আগে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে মুসলিমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। **আল-আকসা মসজিদে** এক বিশেষ মুহূর্তের জন্য ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত

হবে এবং **দাজ্জাল** যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে, তখন মুসলিমরা আল-কুদুসে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করবে। এর পরে **ঈসা (আঃ)**এর নেতৃত্বে মুসলিমরা দাজ্জাল এবং তার অনুচরদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ করবে। এই যুদ্ধের পর আল-আকসা মসজিদ ইহুদিদের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হবে এবং **ফিলিস্তিনে ইসলামের বিজয় হবে।** এই যুদ্ধের পর আল-আকসা মসজিদ এবং আল-কুদুস শহর ইসলামের শাসনাধীনে থাকবে।

➤ ঈসা (আ.) এর অবতরণস্থল ও দাজ্জালের মৃত্যুস্থান

ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) **দ্বিতীয় আকাশে** অবস্থান করছেন। কিয়ামতের আগে তিনি আবার পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি দুজন ফেরেশতার ডানায় ভর করে **সিরিয়ার দামেস্ক শহরে শুভ্র মিনারার** কাছে নেমে আসবেন। আবার **সিরিয়ার বাবে লুদ নামক স্থানে দাজ্জালকে মেরে ফেলবেন।**

- নাওয়াস ইবন সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার দাজ্জাল প্রসঙ্গে দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা করেছেন।...এক পর্যায়ে তিনি বলেন,

“ তখন আল্লাহ ঈসা ইবন মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দুজন ফেরেশতার কাঁধের ওপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রংয়ের জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেস্ক নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা ঝুঁকাবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘাম তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যেকোনো কাফিরের কাছে যাবেন সে তাঁর শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে (সিরিয়ার) বাবে লুদ নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।” (মুসলিম, হাদিস : ২৯৩৭)

➤ ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসস্থল

কেয়ামতের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে মসজিদুল আকসা ও তার আশপাশের ভূমিতে। কেয়ামতের বড় বড় প্রসিদ্ধ দশটি আলামতের একটি হলো ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব। এই ইয়াজুজ-মাজুজ ধ্বংস হবে মসজিদুল আকসা-পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ে।

- ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল সা. বলেন,

এরপর তারা (ইয়াজুজ-মাজুজ) অগ্রসর হতে থাকবে। পরিশেষে তারা জাবালে খামার নামক একটি পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে। জাবালে খামার হলো, বাইতুল মাকদিসের একটি পাহাড়। সেখানে পৌঁছে তারা বলবে, আমরা তো পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এসো, আকাশমণ্ডলীর সত্তাকেও ধ্বংস করে দিই। এ বলে তারা আকাশের দিকে তীর ছুড়তে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের তীরগুলোকে রক্তে রঞ্জিত করে তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিবেন।
হাদিসের শেষাংশে আছে, অতঃপর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড়ে এক প্রকার কীট সৃষ্টি করে দেবেন। যার শিকার হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। (সহীহ মুসলিম-২৯৩৭)

➤ আল-আকসার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা

শেষ জামানায় শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে, তবে তা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছার দ্বারা হবে। ইসলামী ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, মুসলিমরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে না লড়ে তাদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল-আকসা মসজিদের বিশেষত্ব এখানেই, যেখানে মাহদি এবং ইমাম মাহদি ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। এবং **সারা বিশ্বে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং এর কেন্দ্রে ফিলিস্তিন তথা আল-আকসা মসজিদ থাকবে।** এর মাধ্যমে ইসরায়েল এবং অন্য পক্ষে যারা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী ঐক্য ও বিজয় নিশ্চিত হবে।

➤ ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী ভাবনা

বর্তমানে ফিলিস্তিনের অবস্থান ইসলামের শেষ জামানার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, কারণ মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেষ জামানার চূড়ান্ত বিজয় আসবে। এর মধ্যে ফিলিস্তিনের ইসলামী সংগঠনগুলি, যেমন হামাস, ইসলামী জিহাদ ইত্যাদি, এই ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে তাদের সংগ্রামকে যুক্ত করে।

এই ধারণা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে ইসলামী নেতারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের একটি অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেন।

পরিশেষে, আল-কুদুস এবং আল-আকসা মসজিদ ইসলামের শেষ জামানায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিয়ামতের আগে এই পবিত্র স্থানটি বিশ্বের ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠবে এবং মুসলিমরা সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছে, যাতে তারা ইসলামের সত্য এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাবে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রলয়ের দিন এবং পবিত্র ভূমি

➤ প্রলয়ের দিন

ইসলামী ধর্মে **"প্রলয়ের দিন"** (ইয়াওমুল কিয়ামাহ)) বা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। এটি পৃথিবীর চূড়ান্ত অবস্থা, যেখানে সমস্ত সৃষ্টির শেষ হবে এবং আল্লাহর সামনে সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হবে। এই দিনটি সব মানুষের বিচার হবে, এবং তাদের ভালো বা খারাপ কাজ অনুযায়ী তাদের পরিণতি নির্ধারণ করা হবে। ইসলামিক বিশ্বাস অনুসারে, প্রলয়ের দিন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে এই পৃথিবী শেষে হাশরের ফায়সালার পর সঠিক পথে বিশ্বাসীরা চিরকাল শান্তিতে বসবাস করবেন।

➤ পবিত্র ভূমি ও কিয়ামতের সংযোগ

ফিলিস্তিন এবং বিশেষত আল-আকসা মসজিদ ইসলামের পবিত্র ভূমি হিসেবে পরিচিত। ফিলিস্তিন ও ইসলামের শেষ জামানা একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কিত এবং মুসলিম চিন্তায় ফিলিস্তিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংগ্রামগুলির মাঝে।

➤ ফিলিস্তিন হবে হাশরের ময়দান

মানুষ মরণশীল। সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে পরিশেষে উপস্থিত হবে ফলাফল প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণ। তার পূর্বে আয়োজন করা হবে দুনিয়াবাসীদের মিলনমেলার, প্রস্তুত করা হবে ফলাফল প্রকাশের সুবিশাল মঞ্চ। আল্লামা কুরতুবির ভাষ্য মতে, **৪টি হাশরের দুটিই কায়িম হবে দুনিয়াতে।**

➤ হযরত মাইমুনা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: هُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَأَرْضُ الْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ...

হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এটা হবে হাশরের ময়দান। এখান থেকে মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাবে। তোমরা এখানে আসো এবং নামায আদায় করো...। —(মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮)

- নুরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন— رجاله ثقات
- এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। —(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৬৭৫)

ফিলিস্তিন ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র, যা কিয়ামতের বড় বড় নিদর্শনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। দাজ্জাল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভূমিকা, ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংস, এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের গুরুত্ব প্রমাণ করে, ফিলিস্তিন শুধু একটি ভূখণ্ড নয়, বরং এটি ইসলামের ভবিষ্যৎ ইতিহাস এবং আধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্রবিন্দু।

অষ্টম অধ্যায়ঃ উপসংহার

-

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফিলিস্তিনের গুরুত্ব শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ড হিসেবে নয়, বরং এটি একটি ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা মুসলমানদের বিশ্বাস, সংগ্রাম এবং ন্যায্যতার আদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। আল-আকসা মসজিদ, যা মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান, ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, বিশেষ করে নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মেরাজের ঘটনা এখানেই ঘটেছিল। ইসলামের শান্তি, ন্যায্যতা এবং মানবাধিকারের আদর্শ অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ কেবল রাজনৈতিক বা ভূগোলগত বিষয় নয়, বরং এটি ইসলামী শান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগ্রাম। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে ফিলিস্তিন মুসলিম ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে ইসলামের সূচনা, শাসন এবং সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে, ফিলিস্তিনের সংকট মুসলিম বিশ্বের একত্রিত হওয়ার এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে, যা শুধু ফিলিস্তিনের জন্য নয়, বরং মানবাধিকারের প্রতি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার ও ন্যায্যতার প্রতি সংহতির প্রতীক। ইসলামিক শিক্ষার আলোকে, ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত শান্তি, সহযোগিতা এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যেখানে মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করবে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি ইসলামের নীতি অনুযায়ী একযোগে কাজ করে, তবে এটি শুধু মুসলিমদের নয়, পৃথিবীজুড়ে সকল নির্যাতিত মানুষের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা হয়ে উঠবে।

সর্বোপরি, ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ড নয়, এটি তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে একত্রিত করার এবং ইসলামের শান্তি, ন্যায্যতা এবং মানবাধিকারের আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত।

ফিলিস্তিন ও আধুনিক মুসলিম পরিচয়ের প্রভাব

ফিলিস্তিন আধুনিক মুসলিম পরিচয়ের জন্য এক গভীর প্রভাব ফেলেছে, যা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলমানদের চেতনা ও একত্ববোধকে গড়ে তুলেছে।

➤ ধর্মীয় সংহতি ও ঐক্য

ফিলিস্তিন মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংহতি এবং ঐক্য গড়ে তোলে। আল-আকসা মসজিদ এবং ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবন এবং বিশ্বাসের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এটি আধুনিক মুসলিম পরিচয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা মুসলিমদের মধ্যে একতাবদ্ধতা এবং ভাইচারা তৈরিতে সহায়ক।

➤ রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগ্রাম

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম আধুনিক মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি মুসলিম জাতির ন্যায্য অধিকার, স্বাধীনতা এবং মর্যাদার জন্য সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনের সংকট মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এবং প্রতিবাদের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, যা মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থান এবং ঐক্যকে প্রভাবিত করেছে।

➤ আন্তর্জাতিক স্তরে মুসলিম পরিচয়ের প্রতীক

ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিম পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন এবং এর জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে কণ্ঠস্বর তুলে ধরা, মুসলিম বিশ্বের একতা এবং শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি মুসলমানদের আত্মপরিচয়কে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে এবং তাদের ঐক্য এবং সংগ্রামের বার্তা বহন করে।

➤ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

ফিলিস্তিন মুসলিম ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একটি অন্যতম কেন্দ্র। আধুনিক মুসলিম সমাজের মধ্যে ফিলিস্তিনের ভূমি সাংস্কৃতিক গৌরব এবং ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত। এটি মুসলমানদের আত্মপরিচয় এবং সমাজের মধ্যে ঐতিহ্য সংরক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এভাবে, ফিলিস্তিন আধুনিক মুসলিম পরিচয়ের একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে, যা মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থানকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তাদের ঐক্য এবং সংগ্রামের উৎস হিসেবে কাজ করে।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ শান্তি, ন্যায্যতা এবং মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আলোকিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। মুসলিমদের জন্য ফিলিস্তিন শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ড নয়, এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব ও ঐতিহ্যের অংশ, যা তাদের বিশ্বাস, সংগ্রাম এবং ন্যায্যতার আদর্শের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ইসলামের আলোকে, ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে যদি শান্তি, সহযোগিতা, এবং একতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

➤ শান্তির প্রতিষ্ঠা: ইসলামের শান্তির বার্তা

ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠার ধর্ম। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

لَـيۡسَ بِاَ مَا نِيِّكُمۡ وَلَاۤ اَمَا نِيِّ اَهۡلِ الۡـكِتٰبِ‌ؕ مَنۡ يَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا يُّجۡزَ بِهٖ ۙ وَ لَا يَجِدۡ لَهٗ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيۡرًا

"তোমরা সব ধরনের অশান্তি থেকে দূরে থাকতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবে" (সুরা আন-নিসা: ১২৩)।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ শান্তি এবং সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, শুধু ইসলামেরই শান্তির পক্ষে শক্তিশালী সমাধান রয়েছে, যেখানে সকলের অধিকার এবং মর্যাদার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে, তবে স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

➤ ইসলামী ঐক্য: মুসলিম বিশ্বে সমর্থন এবং সংহতি

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, মুসলিমরা একে অপরের জন্য ভাই এবং তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

وَا لْمُؤْمِنُوْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"মুসলমানরা পরস্পরের বন্ধু এবং একে অপরকে সাহায্য করবে" (সুরা তাওবা: ৭১)।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ মুসলিম বিশ্বের ঐক্য এবং সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। যদি মুসলিম দেশগুলো একযোগে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে, তবে এটি শুধু ফিলিস্তিনের জন্য নয়, পুরো মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা হবে।

➤ ন্যায্যতার প্রতিষ্ঠা: ইসলামের আদর্শ

ইসলাম ন্যায্যতার এবং মানবাধিকারের ধর্ম। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর" (সুরা নিসা: ৫৮)।

ফিলিস্তিনের জন্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, ভবিষ্যতে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হলে তা সমস্ত মুসলিম জাতির জন্য সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে আসবে। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা এবং তাদের মানবাধিকার রক্ষা করতে হলে, এটি ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে করা উচিত, যেখানে সবার সমান অধিকার এবং মর্যাদা নিশ্চিত হবে।

➤ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন: ইসলামের অর্থনৈতিক নীতির আলোকে

ইসলাম মানবকল্যাণ এবং উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেয়। মুসলমানদের উপর দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন একে অপরের সাহায্যে সমৃদ্ধি অর্জন করে। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاَ نْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَ يْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَ حْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অর্থের অপব্যবহার করবে না" (সুরা বাকারাহ: ১৯৫)।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ উন্নত হতে পারে যদি তারা ইসলামী নীতির আলোকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং অবকাঠামোর উন্নয়নে কাজ করে। মুসলিম দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি একযোগে ফিলিস্তিনের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেয়, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হতে পারে।

➤ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ: ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদা

ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি মুসলিম বিশ্বে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইসলামের দৃষ্টিতে, জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানানো এবং তা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, ফিলিস্তিনের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব, এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের মুসলিম পরিচয় এবং ঐতিহ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ ইসলামের শান্তি, ন্যায্যতা, ঐক্য এবং সহযোগিতার আদর্শ অনুসরণ করে উজ্জ্বল হতে পারে। যদি মুসলিম জাতি একত্রিত হয়ে তাদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে, তবে ফিলিস্তিন শান্তি এবং স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমি, যা ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে সংযুক্ত। এটি আল-আকসা মসজিদের মতো পবিত্র স্থান ধারণ করে, যা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান এবং নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মেরাজের ঘটনাস্থল। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ফিলিস্তিন মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং ঐতিহ্যের অংশ, যা তাদের বিশ্বাস, সংগ্রাম এবং ন্যায্যতার আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি সৃষ্টি করেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিমদের একতা এবং শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম শান্তি, ন্যায্যতা, মানবাধিকার এবং সহযোগিতার আদর্শ অনুসরণ করে, ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একযোগে কাজ করে, তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করা হয় এবং মানবাধিকারের প্রতি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার অব্যাহত থাকে।

তথ্যসূত্রঃ

কোরআন
হাদীস
রক্তে আকা ফিলিস্তিন
ফিলিস্তিন সংকট
সীরাতুল মুস্তফা
কাসাসুল কোরআন
কাসাসুল আম্বিয়া
আতলাসুল কোরআন
কিসসাতু ফিলিস্তিন
বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস
মসজিদে আকসা: কোটি মুমিনের হৃদয়ের স্পন্দন
আকসা কে আঁসু
আলজাজিরা
উইকিপিডিয়া
উইকিশিয়া
ঢাকা মেইল
ঢাকা পোস্ট
মাসিক আল কাউসার
Islamic landmark
Google
ও অন্যান্য